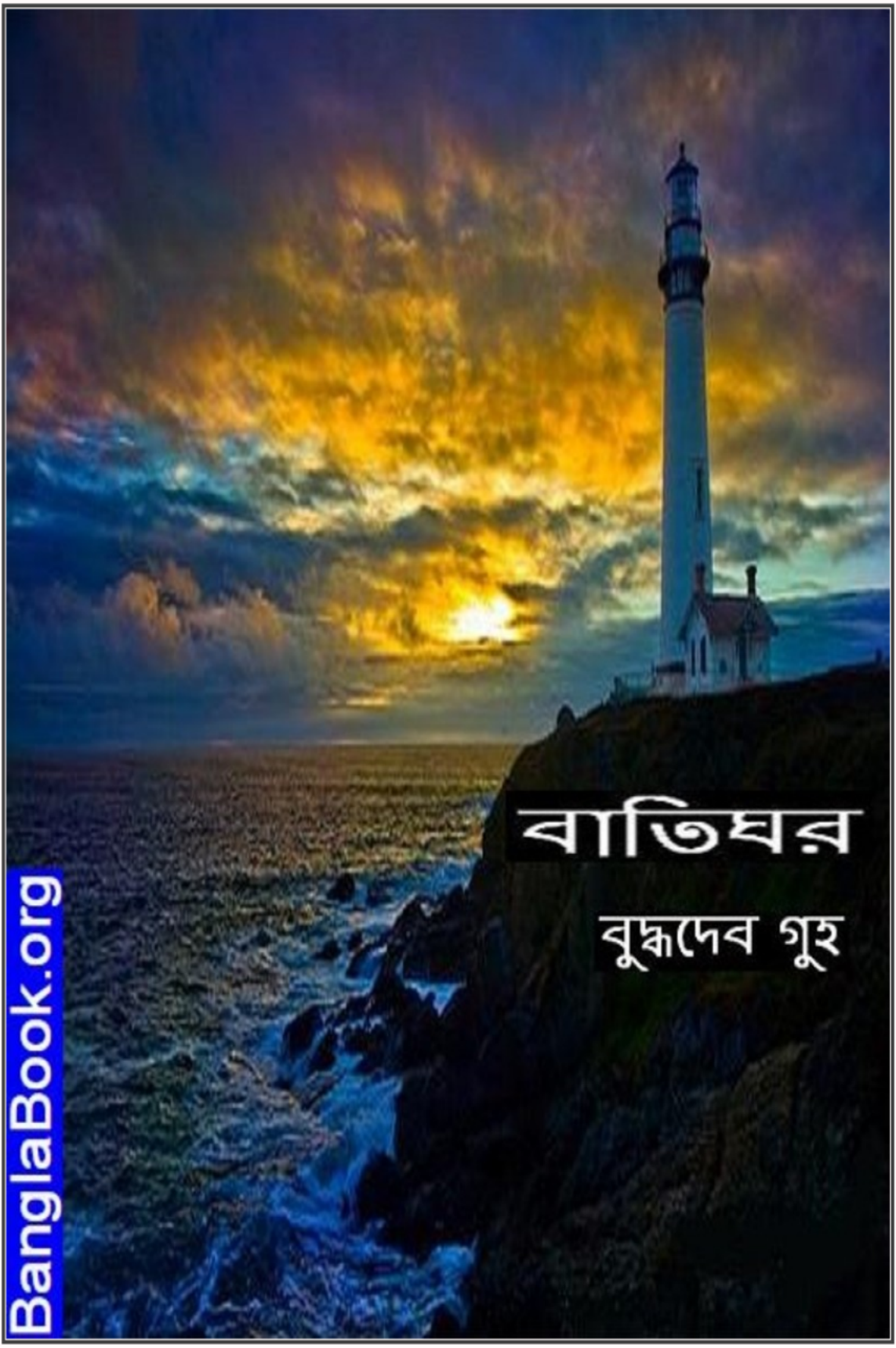

BanglaBook.org

চন্দ্রাইয়া খালি পায়ে একটু দৌড়ে গিয়েই খৈ-ফোটা গরম বালির উপর দাঁড়িয়ে পড়ে পা দিয়ে তাড়াতাড়ি একটু বালি খুঁড়ে নিল, উপরের বালি সরিয়ে নীচে ঠাণ্ডা বালিতে পা রেখে দাঁড়াল।

ওপাশ থেকে একটি জেলেনি বুড়ি ছোটকঁলু টানতে টানতে আসছিল। সেও দাঁড়িয়ে পড়ে পা দিয়ে বালি সরাল। ওরা দু'জনে হাত নেড়ে নেড়ে কী সব কথাবার্তা বলল তেলেগুতে।

ততক্ষণে চন্দ্রাইয়া যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে পৌঁছে গেল জয়।

চন্দ্রাইয়া বলল, চল বাবু, আরও আগে চল।

ওরা দু'জনে ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে বালি মাড়িয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

এখন প্রায় এগারোটা বাজে।

সমুদ্র থেকে জোর হাওয়া আসছে। মিহি বালি হাওয়ায় উড়ছে—ফিসফিস করে বালিয়াড়ির গায়ে সাদা জর্জেটের জমির মতো পাতলা আস্তরণ জমছে বালির। মাথার উপর একটা শঙ্খচিল ঘুরে ঘুরে উড়ছে—ছুঁচের মতো সরু স্বরে ডাকছে চিঁ-হ-ই-চিঁ-ই। কার যেন কত জন্মের জমানো দীর্ঘশ্বাস সেই ডাকে ছড়িয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত বালিয়াড়ি বালিয়াড়িতে। ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে উড়ন্ত চিলের ছায়া কাঁপছে। শব্দহীন ডানা-মেলা ছায়াটা ঘুরছে, কাছে আসছে; দূরে যাচ্ছে বারে বারে।

জয় বলল, চন্দ্রাইয়া, আর কতদূর ?

—আরও বহুত দূর বাবু। পাউন্ড সাহেবের বাংলো অনেক দূর।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল জয় চ্যাটার্জি। গরমটা বেশ বেশি। পরিত্যক্ত গলফ্ লিঙ্কসের পাশের পথের একটা কালভার্ট পেরোবার সময় তার উপর বসে পড়ল জয়, কাজুবাদামের ছায়ায়। বলল, একটু বসে নিই চন্দ্রাইয়া—আজকে একটু বেশি সাঁতার কাটা হয়ে গেছে—হাঁটতে দম পাচ্ছি না গরমে।

চন্দ্রাইয়া হাসল। দ্ব্যর্থক গলায় বলল, এই বয়সেই দম পাচ্ছ না বাবু, বয়স তো পড়ে আছে।

জয় উত্তর না দিয়ে মাথা থেকে খড়ের টুপিটা খুলে ফেলে একটা ছোটকঁলু ধরাল।

কাজুবাদামের পাতায় পাতায় গরম হাওয়া বইছিল। দূরে পামগাছের ছায়াঘেরা মিসেস জেনিফার স্টেইনের গেস্ট হাউসের সাদা উঁচু বাড়িটার পেছনটা নীল আকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছিল। কিচেন থেকে ধোঁয়া উড়ছিল। সাদা উর্দিপরা বেয়ারারা পেছনের বারান্দায় ঘোরাফেরা করছিল।

চন্দ্রাইয়া বলল, বাবু, তুমি পাউন্ড সাহেবকে আগে চিনতে ?

—আগে চিনতাম না। এখানেই দেখা হল।

—এখানেই চিনলে ? সমুদ্রে চান করতে গিয়ে ? তার আগে চিনতে না ?

—আগে চিনব কী করে ?

হাঁটতে হাঁটতে চন্দ্রাইয়া বলল, তোমার কী দরকার ওর সঙ্গে ?

—দরকার আছে। বলল জয়। তারপর চন্দ্রাইয়ার বকবকানি উপেক্ষা করে ছোটকঁলু টানাতে মনোনিবেশ করল।

জয় ভাববার চেষ্টা করল, ফাদার পাউন্ডকে ওর এত ভাল লেগে যাবার হঠাৎ কী কারণ ? কত

BanglaBook.org

পাদ্রিই তো এতদিন দেখেছে—পাদ্রিদের কলেজে পড়েছে—অথচ এই সমুদ্রপারে বেড়াতে এসে পাউন্ড পাদ্রি সম্বন্ধে ওর এত আগ্রহ হল কেন ?

শুনেছে ফাদার পাউন্ড বেলজিয়ান। ফাদারের ঘন নীল চোখ। গুণ্ডার মতো চেহারা। সকালে এবং বিকেলে সমুদ্রে যখন অরফ্যানেজের মেয়েগুলোকে সাঁতার শেখান পাউন্ড সাহেব, তখন ওঁকে দেখে মনে হয়, এখানের অশান্ত সমুদ্রকে চ্যালেঞ্জ করার মতো যেন ওঁর মধ্যে কিছু আছে। ওঁর দু হাতের পেশীতে, ওঁর দারুণ সবল পুষ্ট উরুতে, ওঁর নীল চোখের তারায়, ওঁর সরল ঋজু ভঙ্গিতে, কোমরে হাত দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মধ্যে—ওঁর সাঁতার কাটা, ওঁর এই সমুদ্রপারের বালিতে লাথি মেরে মেরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলার মধ্যে এমন কিছু একটা দেখেছে জয় চ্যাটার্জি যে ফাদার পাউন্ডকে তার খুব ভাল লেগে গেছে।

দু'দিন আগে বিকেলবেলা বেড়িয়ে ফিরে আসছিল জয় মিসেস স্টেইনের গেস্ট হাউসে। অন্ধকার হয়ে গেছিল। দু'পাশের ঝাউবন আর কাজুবাদামের গাছের ছায়া পথের উপর ঘন হয়ে পড়েছিল। ফণিমনসার ঝোপে তক্ষক ডাকছিল টুক্-টুক্ করে—এমন সময় জয় দেখতে পেল ফাদার পাউন্ড একটা ঘি-রঙা শর্টস পরে খালি পায়ে, খালি গায়ে সমুদ্র থেকে উঠে বড় বড় পা ফেলে ফেলে হেঁটে আসছেন ওর বিপরীত দিক থেকে। ওঁর পাশে পাশে সেই কালো সুইমিং কস্ট্যুম-পরা মেয়েটিও হেঁটে আসছিল। ওই মেয়েটিকে ফাদার পাউন্ডের পাশে পাশে সব সময়ই দেখছে জয়—যে ক'দিন এসেছে এখানে।

ওঁরা হাঁটতে হাঁটতে একেবারে মুখোমুখি এসে গেল। পাউন্ড সাহেবের চওড়া লোমশ নোনা-জলে ভেজা বুকে একটা চেনে বাঁধা এনোডাইজ করা ক্রুশ দুলছিল। জয় বলল, গুড ইভনিং। ফাদার পাউন্ড দাঁড়িয়ে পড়লেন ; মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, গুড ইভনিং ; বলেই পা বাড়ালেন।

জয় ওঁকে আবার বলল, ফাদার, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

পাউন্ড সাহেব বললেন, কাম টু দ্য চার্চ টুমরো।

জয় বলল, আমি ক্রিশ্চান নই। তোমাকে আমার এমনি কিছু ব্যক্তিগত কথা শুধোবার আছে।

সাহেব বললেন, দেন কাম টু আওয়ার বাংলো অন দ্য ক্যাপসিকাম রোড—অ্যাবাউট ইলেভেন টুমরো।

সাহেব যেতে বলেছিল, জয় তাই যাচ্ছে। গিয়ে ঠিক কী শুধোবে তাঁকে তাই মনে মনে এঁচে নিচ্ছিল। প্রশ্নগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছিল।

চন্দ্রাইয়া মুখ তুলে দেখল, জয়কে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

জয় আর চন্দ্রাইয়া কালভার্ট ছেড়ে উঠতে যাবে—এমন সময় ওরা দেখতে পেল ফাদার পাউন্ড অন্যান্য অনেক পাদ্রির সঙ্গে দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছেন এদিকে।

ওদের দেখেই পাউন্ড সাহেব তাড়াতাড়ি দল ছেড়ে এসে বললেন, আই অ্যাম অ-ফুলি সরি—একটা ড্রাউনিং অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। অরফ্যানেজের একটি মেয়ে মারা গেছে আজ সকালে ব্যাকওয়াটারের কাছে। একটা স্পেশ্যাল মাস আছে গির্জায়—আপনি পরে একসময় আসবেন, কেমন ?

পাদ্রির দল একটুকরো সাদা মেঘের মতো সাদা পোশাক উড়িয়ে সনসনিয়ে চলে গেল।

জয় টুপিটা পরে উঠে দাঁড়াল কালভার্ট থেকে। একবার জোরে নিশ্বাস নিল। মনে মনে বলল, বাঁচা গেল। যা বলার যদি গুছিয়ে না বলতে পারতাম ? এ যাত্রা বাঁচা গেল।

গেস্ট হাউসের দুটো উইং। জয় চ্যাটার্জি বাঁ দিকের উইং-এ আছে। ওর একপাশের ঘরে একটি বছর কুড়ি-বাইশ বছরের বাঙালি ছেলে, তোতো সেন, কলকাতা থেকে এসেছে। খুব কম কথা বলে, সমুদ্রে একদিনও চান করে না ; একটু দাড়ি আছে। বেশির ভাগ সময় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বসে বই পড়ে। মাঝে মাঝে কাগজ-কলম নিয়ে কী যেন সব লেখে। অন্য পাশের ঘরে ব্যারিস্টার হিতেন মিত্তির এবং তাঁর এক বন্ধু ঘণ্টু ঘোষ। তার পাশের শেষ ঘরে মিসেস জেমস এবং তাঁর কিশোরী মেয়ে জুডিথ্।

BanglaBook.org

সুইমিং ট্রাঙ্কটা বাইরে ঘাসের উপর শুকোচ্ছিল, সেটা ঘরে তুলে রেখে এসে জয় ঘরের সামনের আর্মচেয়ারে বসে পড়ল।

লাল ভেটকিতে নৌকো বোঝাই করে সমুদ্রের গভীর থেকে জেলেদের ক্যাটামেরনগুলো ফিরে আসছিল এক এক করে। জয় বসে বসে দেখছিল।

জয় বলল, কী তোতো ? আজ চান করবে নাকি বিকেলে ? বলো !

তোতো যেন সমুদ্রের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখছিল, চমকে উঠে বলল, না না, আমি না।

জয় হাসল। বলল, কেন ? তুমি কি সাঁতার একেবারেই জানো না ? সমুদ্রকে ভয় পাও বুঝি ?

—সাঁতার জানি, কিন্তু সে জন্য নয়। আমার ভাল লাগে না।

—কেন ভাল লাগে না ?

—এমনি।

তারপর জয় একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে বলল, তুমি সব সময় কী লেখো তোতো ? তুমি কি কবিতা লেখো ?

তোতোর মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, মানে লেখার চেষ্টা করি। তবে কবিতা নয়।

এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাইল না তোতো। অন্তত তাই মনে হল জয়ের।

—তুমি কলকাতায় কী করো ?

—পড়ি। য়্যুনিভার্সিটিতে।

—তাহলে তুমি নিশ্চয়ই রাজনীতি করো ? বলে জয় হাসল।

তোতোর সেই উজ্জ্বল ও হাসি-হাসি মুখ বদলে গিয়ে সে-মুখে হঠাৎ যেন চে'গুয়েভারার টুপি পরা মুখ এঁটে বসল।

ও বলল, হ্যাঁ, আমি রাজনীতি করি। কেন, যারা রাজনীতি করে তাদের আপনি ভয় পান কি ?

জয় হেসে উঠল ওর কথার ভঙ্গি দেখে। বলল, সে কথা নয়। আমার জানতে ইচ্ছা করে তুমি মনেপ্রাণে কী বিশ্বাস করো ?

—আপনি জেনে কী করবেন ?

—না, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম তোমার বিশ্বাস আছে কি না ?

তোতো বলল, একথা বলছেন কেন ? তাতে আপনার কী সন্দেহ আছে কোনও ?

জয় তোতোর দিকে ফিরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, এটা সন্দেহ নিঃসন্দেহের ব্যাপার নয় তোতো। এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন। আমি জানি না, শেষ পর্যন্ত কেউ আমরা আমাদের বিশ্বাসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব কি না !

তোতো হঠাৎ যেন অনেক বড় হয়ে গিয়ে ভারী গলায় বলল, ইট অল ডিপেন্ডস্, আপনি আপনার বিশ্বাসের পাশে কী নিয়ে দাঁড়াতে চান ?

জয় বলল, কী নিয়ে দাঁড়াতে চাই, সেটা বড় কথা নয়। আমার মনে হয় তোতো, আমরা একটা ভীষণ অবিশ্বাসের যুগে বাস করছি। আমরা সকলেই সব সময় খুঁজতে চাইছি, জানতে চাইছি বিশ্বাস আছে কি না। শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাস নয়, সব বিশ্বাস। আমরা জানতে চাইছি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস আমাদের চোরাবালিতে ডুবিয়ে দেয়, না দাঁড় করিয়ে রাখে। আমি জানি না, তোমাকে বোঝাতে পারলাম কিনা, আমি পার্সোনাল বিশ্বাসের কথা বলছি। অ্যাবসোলুটলি পার্সোনাল বিশ্বাস-অবিশ্বাস।

তোতো অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। বলল, বোধ হয় আপনার কথা বুঝেছি। তবে, বিশ্বাস হয়তো আছে। বিশ্বাস না থাকলে বিশ্বাস করি কী করে ? কিন্তু ব্যাপারটা আপনার মতো করে ঠিক এই অ্যাঙ্গেলে কখনও ভাবিনি।

তারপর ওরা দু'জনে চুপ করে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ পর জয় বলল, পিস্তল চালাতে জানো ?

তোতো হাসল। কেমন এক দুর্বোধ্য হাসি।

জয় বলল, কী ? জানো ?

তোতো আবার হাসল। এবার হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, জানি, তবে তাক নেই।

BanglaBook.org

আমার এক কাকার ছিল, সেটা ছুঁড়েছিলাম।

জয় বলল, আজ বিকেলে আমার সঙ্গে চলো, পিস্তল ছুঁড়বে।

তোতো লাফিয়ে উঠল, বলল, আপনার সঙ্গে আছে?

—আছে।

—সঙ্গে এনেছেন? আপনি কি সব সময়ে কোনও ভয়ে ভীত আছেন?

জয় হো হো করে হাসল, বলল, না তা নয়, ওটাকে আমি সব সময় সঙ্গে নিয়ে বেড়াই—তোমার লেখার খাতার মতো—সঙ্গে না থাকলে হাতটা খালি খালি লাগে।

এমন সময় ওপাশ থেকে হিতেন মিত্তির ডাকলেন, চাটুজ্জে—এদিকে আসবে?

জয় মুখ ঘুরিয়ে ওদিকে চেয়ে বলল, আসছি।

তোতো বলল, আপনি যান, ওঁরা ডাকছেন। বিকেলে সত্যিই নিয়ে যাবেন তো আমাকে?

জয় হাসল, বলল, নিশ্চয়ই। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব, কেমন?

তোতো খুশি হল। বলল, আচ্ছা।

জয় ওদিকে যেতেই হিতেন মিত্তির বলল, বোসো, বোসো—কোথায় কোথায় রোদে রোদে ঘুরে বেড়াও টো টো করে!

—এই গেছিলাম একটু পাদ্রি সাহেবের খোঁজে।

—কেন? পাদ্রি কেন? তুমি কি কনফেশান করবে নাকি?

—না, তা নয়, এমনি আলাপ করতে গেছিলাম।

ঘণ্টু ঘোষ হঠাৎ বলে উঠলেন, সজনে ডাঁটার সঙ্গে কুমড়ো দিয়ে চচ্চড়ি এবং নিম-বেগুন, সঙ্গে কলাইয়ের ডাল—বুঝলে!

জয় বলল, আমাকে বলছেন?

—না, তোমাকে নয়, হিতেনকে বলছিলাম, এই সময় শরীরের পক্ষে এই সব খবার সবচেয়ে ভাল, তা নয়তো এই স্যাহেরি হোটেলে এই গরমে সব গরম গরম রান্না। শরীরকে বড় উত্তেজিত করে তোলে।

হিতেন মিত্তির পাইপের টোব্যাকো খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, বউ মরে গেলে লোকগুলো সব এই রকম আন-ব্যালান্সড্ হয়ে যায়। হচ্ছিল পাদ্রির কথা, এসে গেল সজনে ডাঁটা।

—যাকগে, ভাল কথা জয়, আমার টিনড সার্ডিনের কী বন্দোবস্ত করলে? বেয়ারা বলছিল কাছে-পিঠেই এক তেলেগু ভদ্রলোক সার্ডিন স্যামন এবং লবস্টার ক্যান করেন; ফ্যাক্টরি বসিয়েছেন। তুমি তো রোজই হাঁটাহাঁটি করতে দূর দূর যাও, একটু খোঁজ কোরো না ভায়া—কয়েক টিন ভাল সার্ডিন নিয়ে যাব। কী বলো ঘণ্টু?

ঘণ্টু ঘোষ জবাবে কিছু বললেন না, স্মোকারস্ কাফ্ কাশলেন—খোঁখোর—র র্ র্ খরর—খঁক্।

হিতেন মিত্তির বললেন, তোর দাঁতের পাটিটা ভাল বাঁধানো হয়নি। একেবারে পনেরো বছরের ছেলের দাঁত বলে মনে হচ্ছে। তার ওপর আবার মাঝে মাঝে খুলে যায়। এখানে আসা অবধি দেখছি। যা, ওইখানে বসে গরম বালিতে ওটাকে ভাল করে ঘষো দেখি, তাহলে চকচকে ভাবটা চলে যাবে।

—বলছিস? বলেই ছেলেমানুষের মতো হিতেন মিত্তিরের দিকে তাকালেন একষট্টি বছরের ঘণ্টু ঘোষ। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে কষ্টেসৃষ্টে ওই ভারী দেহটা নিয়ে উঠে গিয়ে ওই গরমে উবু হয়ে বসে গরম বালিতে নতুন বাঁধানো দাঁতের পাটি দু'টি ঘষতে লাগলেন।

—নাও, একটা সিগারেট খাও। বলে হিতেন মিত্তির ঘণ্টু ঘোষের টিন থেকে একটা স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট এগিয়ে দিলেন জয়ের দিকে।

সিগারেটটা ধরিয়ে জয় বলল, আজ সকালে ব্যাকওয়াটারের দিকে একটি মেয়ে ডুবে মারা গেছে।

হিতেন মিত্তির বললেন, ভেরি স্যাড।

ঘণ্টু ঘোষ ফিরে এসে বললেন, কে মরেছে?

—একটা মেয়ে মরেছে, অরফ্যানেজের।

BanglaBook.org

এমন সময় জুডিথ্ তোয়ালে হাতে করে বিকিনি পরে বারান্দা বেয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল।

সমুদ্রটা এখন উথাল-পাথাল করছে। জেলেদের ক্যাটামেরনগুলো ফিরে এসেছে—কিছু এখনও ফিরছে। আর অরফ্যানেজের মেয়েরা একজনও নেই। চার পাঁচটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে সমুদ্রের পারে বালির উপর পাতায়-ছাওয়া ঘরে একবার বসছে আবার গিয়ে একটু সাঁতার কাটছে। ওদের রঙিন কস্ট্যুম-পরা নৃত্যরত ফিগারগুলো দুপুরের সমুদ্রের দুরন্ত পটভূমিতে দারুণ দেখাচ্ছে। জুডিথ্ ওদের দিকে নেমে গেল শর্টকাটে—ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে।

মিসেস জেমস্ তার ছোট কালো কুকুরটাকে নিয়ে ফেনায় পা ডুবিয়ে বসে আছে। মিসেস্ জেমস্ কোনওদিন সাঁতার কাটে না। সাঁতার জানে না হয়তো। রোজই বালিতে আর ফেনায় গড়াগড়ি যায়—কুকুরটা ভুক্ ভুক্ করে এগোয় পেছোয়—ঢেউয়ের সঙ্গে নিচু হয়ে ওড়া সী-গালদের তাড়া করে—ঢেউয়ের আছড়ানির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে—আর মিসেস জেমস্ একটি পাঁচ-ছ' বছরের খুকির মতো পরম আহ্লাদে চিৎকার করে। বালিতে একটি পাকা লাল কুঁকড়োর মতো গড়াগড়ি যায় আর চেঁচায়—আঁউ, আঁউ—উঁ।

তেলেগু জেলেনিরা রঙিন শাড়ি পরে মাছের ঝুড়ি মাথায় সমুদ্রের পার বেয়ে কোথায় না কোথায় হেঁটে যাচ্ছে। ক্যাটামেরনের মতো কালো গায়ের রঙে দুপুরের রোদ জেল্লা দিচ্ছে। হাওয়ায় ওদের শাড়ি সরে সরে যাচ্ছে—উরু অবধি অনাবৃত হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দলে দু-একজন পুরুষকেও দেখা যায়। পুরুষদের সরু কালো কোমরে ধবধবে সাদা কাপড়ের টুকরো ল্যাঙোটের মতো জড়ানো। এদের দেখে মনে হয় এরাও একরকমের সামুদ্রিক জীব—লাল ভেটকি, ঝিনুক অথবা টাইগার শার্কের মতো। সমুদ্রের গন্ধ ওদের গায়ে। সূর্যের কুচি ওদের চোখে।

হিতেন মিত্তির বললেন, চলো, জয়, বারে যাওয়া যাক। বিয়ার খাই।

ঘণ্টু ঘোষ বললেন, থাক না—এখানে বসেই হোক। তবে আমি কিন্তু বিয়ার খাব না।

—তো কী খাবি ?

—পিংক জিন।

—আর জয় ?

জয় বলল, আপনারা বসুন মিত্তির সাহেব, আমার ক'টা চিঠি লিখতে হবে।

—আরে চিঠি লিখবে বইকী। ইয়াং ম্যান, তোমাদের মতো বয়সে আমরাও অনেক চিঠি লিখেছি আতর-মাখা নীল কাগজে। লাঞ্চের পরই না হয় লিখো। চলো না, একটু গল্প করা যাবে।

জয় অনুনয়ের স্বরে বলল, না—প্লিজ, আজ না, কিছু মনে করবেন না।

ঘণ্টু ঘোষ বললেন, কেন ওকে জোর করছিস হিতু—ছেড়ে দে। তবে সময়মতো লাঞ্চে আসবেন চাটুজ্জে, আমরা টেবলে অপেক্ষা করব।

২

ব্যাকওয়াটারের দিকটা খুবই নির্জন। জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে জোরে জল ঢোকে শ্বেতোচ্ছ্বাসে। রুপোলি সি-গালের ঝাঁক নিচু হয়ে ঢেউয়ের কাঁধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়ায়। ছোঁ মেরে মেরে ছোট সার্ডিন ধরে—ডানার রুপো, জলের রুপো, সার্ডিনের গায়ের চিকন রুপো শেষ সূর্যের সোনায় ঝিকমিক করে ওঠে। নোনা হাওয়ার গন্ধ লাগে নাকে। পাখিরা ওদের সংক্ষিপ্ত ভাষায় চিকন চাবুকের মতো ডেকে ওঠে। হাওয়াটা সেই ক্ষণস্থায়ী তীক্ষ্ণ শব্দের টুকরোগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ব্যাকওয়াটারের ঘন ঝাউবনে।

একটা নৌকো থাকে ঘাটে—যেটায় এপার-ওপার করা যায় ব্যাকওয়াটারের। কোনও উৎসাহী ট্যুরিস্ট মিষ্টি জলের মাছ ধরার আশায় কখনও-সখনও নৌকো নেয়। আর নেয় হানি-মুনিং কাপল্‌রা। ব্যাকওয়াটারের ওপারে গিয়ে হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে ওরা ঝাউবনের আড়ালে হারিয়ে যায়—তখন ওদের মুখ দেখে মনে হয় ওদের জন্যে অন্য কোনও অনাঘ্রাত পৃথিবী বুঝি ওইদিকে লুকোনো আছে।

BanglaBook.org

সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে নিয়ে-আসা একটা খালি কাগজের বাক্সকে বালিতে বসিয়ে রেখে, জয় পিস্তলটা তোতোর হাতে তুলে দিয়ে বলল, এসো তোতো, মারো।

তোতো জিজ্ঞেস করল, কত বোরের পিস্তল ?

জয় বলল, পয়েন্ট থ্রি টু।

—কী মেক ?

—কোল্ট।

তোতো জয়ের পাশে দাঁড়াল। তোতো মুখ তুলে তাকাল জয়ের দিকে।

জয় বলল, তাকাচ্ছ কী, আরম্ভ করো !

গুম করে গুলি হল। গুলিটা ওদের মেক-শিফট্ টার্গেটের ধারে-কাছে না গিয়ে বালিয়াড়ির নীচে গিয়ে লাগল। টার্গেটের দশ হাত নীচে।

তোতো লাজুক-মুখে বলল, ভীষণ বাজে হল, না ? আমি খুব বেশি তো ছুঁড়িনি আগে।

—অনেকের চেয়ে তোমার হাত ভাল। ওরা তো রাস্তায় গুণ্ডাদের তাক করে দোতলার ঘরের মহিলাকে মেরে ফেলে। সে তুলনায় তুমি অনেক ভাল মেরেছ। পিস্তলে রিভলবারে হাত ঠিক করতে সময় লাগে। নাও আবার মারো। চেম্বারটা খালি করো।

গুম গুম করে পর পর গুলি করে চলল তোতো। কপালের উপর পাশ ফিরিয়ে আচড়ানো ওর চুলে, ওর কালো চশমার ফ্রেমে, ওর মুখে উত্তেজনার আভা লাগল। চেম্বারটা খালি করে ও পিস্তলটা জয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, দারুণ লাগে, না ?

—কী ?

—পিস্তল ছুঁড়তে। মনে হয় আমার ইচ্ছেটা গুলির সঙ্গে সবেগে গিয়ে সশব্দে কাউকে বিদ্ধ করছে।

জয় হাসল। বলল, আচ্ছা তোতো, তুমি পিস্তল হাতে পেলে প্রথম কাকে মারবে ?

তোতো জয়ের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ বলল, সম্মানকে।

—তার মানে ? সে তো অনেক আগেই মারা গেছে। জয় হেসে বলল।—তাকে যেদিন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন তুমি দেখোনি ?

তোতো জয়ের দিকে মুখ তুলে বলল, হয়তো কেউ বা কারা তাকে নিয়ে গেছিল, কিন্তু সে আবার বেঁচে ফিরে এসেছে—আগেকার দিনের সতীদের মতো। সেটা বোধ হয় আপনি জানেন না। তবে ওকে আমি মারবই মারব।

—কেন ? সম্মানের ওপর তোমার এত রাগ কেন ? তুমি কি কাউকেই সম্মান করো না ?

—করি না।

—তোমার বাবাকে সম্মান করো না ?

—বাবা বলেই সম্মান করতে হবে নাকি ? আমার বাবাকে আমি সম্মান করি না। করুণা করি।

—কেন ?

—করুণার যোগ্য বলে। জানেন, অফিসের ঘরে গুরুদেবের ছবি টাঙিয়ে রাখত বাবা। আমার মনে হয়, ঘুষ খাবার আগে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলত—গুরুদেব ! গুরুদেব !

বাবার জন্যে সত্যি তার করুণা হয়। এত বয়স হয়ে গেল, এখনও জানল না বা জানার চেষ্টা করল না কখনও, কীসে কী হয়। বাবাদের যৌবনে বোধ হয় বাবারা বিশ্বাস করত, যার টাকা আছে তার কাছে সব সুখ থাকবে ; বাঁধা থাকবে পোষা কুকুরের মতো।

জয় বলল, তোমার বাবা হয়তো তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই ঘুষ খেয়েছিলেন। শুধু তোমাদের ভালর জন্যেই।

—জানি না, হয়তো হবে। কিন্তু কী লাভ হল ? আর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি তো গোকুলে বাড়ছি বাবাকে ধড়কাব বলে।

একটু থেমে নিয়ে তোতো আবার বলতে শুরু করল, সম্মানের লোভ যদি কিছু না থাকত, তবে কেন বাবা এমন ইডিয়টের মতো কাজ করত বলুন ? বাবা ভেবেছিল, বুড়ো বয়সে একটা বাড়ি করে

BanglaBook.org

ফেলতে পারলেই চামেলি তেলের গন্ধের মতো সম্মানের গন্ধ কপাল বেয়ে পড়বে। ছেলেমেয়ে সব ঠাকুমার ঝুলির পাখির মতো বারান্দায়, জানালায় বসে বাবার প্রশস্তি গাইবে।

জয় বলল, দেখো তোতো, তোমার বাবাকে আমি চিনি না পর্যন্ত। ভদ্রলোকের সম্বন্ধে একজন স্বল্প-পরিচিত লোককে এত কথা বলা তোমার ঠিক হচ্ছে না।

তোতো বলল, আমার বাবাকে চেনেন না ? হাসালেন আপনি। অফিস ছুটির সময় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন—যত ট্রাম বা বাস যাবে, তাদের জানালায় ভাল করে তাকাবেন, দেখবেন প্রতি পাঁচজনে একজন করে আমার বাবা বসে আছে। তাদের হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ, নয় অ্যাটাচি। কারও পরনে হাওয়াই শার্ট, মুখে গোবেচারা নয়তো হামবড়াই ভাব। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার বাবারা চাপে পড়ে আবার মাঝে মাঝে মিছিলেও ভিড়ে যায়—যাত্রাদলের বিবেকের মতো সুর করে করে গলা কাঁপিয়ে বলে—'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে'—আর মাঝে মাঝে সেদিনই পাওয়া এক শো টাকার নোটের বাণ্ডিলটা পোর্টফোলিও ব্যাগের মধ্যে খচরমচর করছে কিনা দেখে নেয়। অথচ আশ্চর্য ! মিছিলের লোকেরা টেরও পায় না যে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের কেউই নয়।

জয় বলল, তোতো, তুমি খুব সাংঘাতিক ছেলে। তুমি নিজে তোমার বাবার বয়সে পৌঁছে ঘুষ খাও কি না এখনও তা দেখা হয়নি। তাই তোমার এতসব কড়া মন্তব্য নিজের বাবা সম্বন্ধে একটু প্রিম্যাচিওর।

—নাঃ, আপনাকে নিয়ে চলে না। আমি তো এক শো বার ঘুষ খাব—এখন যে ঘুষ না খায় সে তো ইডিয়ট—যারা খায় না তাদের নেহাত খাবার সুযোগ নেই অথবা সাহস নেই। এখন সমস্ত পৃথিবী ডিস্‌অনেস্ট—অ্যান্ড আই উইল সিম্পলি জাস্ট ফিট ইন অ্যাজ আ কম্পোনেন্ট। সম্মান বলে এখনও যদি কিছু থেকে থাকে তো সম্মানের সেই অংশাবশেষকে আমি এবং আমরা সাবড়ে দেব। ঘুষ খাওয়াটা হয়তো আজকালকার দিনে অন্যায় নয়, কিন্তু ঘুষ খেয়েও সম্মান কুড়োবার আশাটা অন্যায় ; সেটা ভণ্ডামি।

—আচ্ছা তোতো, এত কথা যে বলছ, তুমি যে মিসেস স্টেইনের গেস্ট হাউসে আছ, এ কি তোমার নিজের টাকায় ? তুমি তো রোজগার করো না !

তোতো অবাক হয়ে বলল, আমার বাবার টাকায়, অব্‌ভিয়াসলি।

—তবে ! তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত—যাঁর টাকায় তুমি বাবুয়ানি করছ তাঁকেই সব সময় তুমি যা-তা বলছ ?

তোতো হাসল। বলল, আমার দারুণ লাগে—বাবার চোখের সামনে বাবার চুরির রোজগার দু'হাতে ওড়াতে। বাবা নিজে কোনওদিন থার্ড ক্লাস ছাড়া চড়েনি—আমি কিন্তু সব সময় এয়ারকন্ডিশানড্ ক্লাসে ট্রাভল করি। বাবার তিল তিল করে সঞ্চয় করা টাকা, বাবার সম্মান পাবার আকাঙ্ক্ষার উপর আমি বুটজুতো পরে হেঁটে যাই—বাবা, তার বন্ধু-বান্ধব, তাদের ভুল ধারণা, তাদের ভণ্ডামির মৌচাকে আমি প্রতি মুহূর্তে ছেঁড়া চটি ছুঁড়ে মারি।

—তোমার বাবার টাকা তো তোমারই জন্য। তুমি সে টাকা এভাবে নষ্ট করে তো নিজেরই ক্ষতি করছ।

—ফুঃ ! কারও টাকাই কি কারু জন্য থাকবে জয়দা ? সেদিন শেষ হয়ে গেছে। বাবা, মামা, পিসেমশায়ের দিন শেষ হয়ে গেছে—আমরা শেষ করে দেব। নদীর পাড় ভেঙে যাচ্ছে। কোনদিকে চর জাগবে তা জানি না, কিন্তু জানি যে, এখানে পাড় ভাঙছে। আপনি কি কালা ? পাড় ভাঙার প্রচণ্ড শব্দ কি শুনতে পাচ্ছেন না ?

—জানি না তোতো। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি না। হয়তো নদীর হাওয়ার সঙ্গে দূরের গুমগুমানি শুনেছি কখনও-সখনও, তোমার মতো এত স্থির-প্রত্যয়ে শুনিনি।

—নিশ্চয়ই শুনবেন। শুনবেন সেই কলরোলা নদীর সর্বগ্রাসী, ঘূর্ণায়মান জলের তোড়ে আমাদের এতদিনের বিশ্বাস, সম্মান, এতদিনের সম্পত্তির কামনা, কভেনান্টেড চাকরির লোভ, বড়লোক মামাকে তেল দেওয়ার ইচ্ছা, সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে—সব ভেসে যাচ্ছে। আজ না

BanglaBook.org

হলেও একদিন শুনতে পাবেন।

এই অবধি বলেই তোতো থেমে গেল। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলল। বলল, বেশ নাটুকে মনে হচ্ছে, না ? আজকের সন্ধেটা ? আপনি পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি বালির ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছি—ব্যাকড্রপ হিসেবে শেষ বিকেলের সমুদ্র। এখন কেউ একটা লঙ শট নিত—তবে না জমত ?

ব্যাপারটা কী জানেন, কোনও উঁচু জায়গায় দাঁড়ালেই আমাকে বক্তৃতায় পায়—গলা কাঁপিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে করে, যা আমি বিশ্বাস করি।

জয়দা, আমি জানি না আমি যা বললাম তা ঠিক কি ভুল। আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান এখনও তা নির্ভুলভাবে বোঝার মতো হয়নি। তবে একটা ওলোট-পালোট হওয়া দরকার যে, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিছু মনে করবেন না, আমাদের আগের জেনারেশানের জন্য অনেক দুঃখ লেখা আছে। কেন জানি না, মনে হয় পৃথিবীটা ভীষণ পুরনো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ঘরের ফার্নিচারের অ্যারেঞ্জমেন্ট বদলালে যেমন নতুন ঘরে বাস করছি বলে মনে হয়, তেমনি পৃথিবীর বর্তমান ফার্নিচার ফিক্সচারগুলো বদলানো দরকার—এক্ষুনি। পৃথিবীর রং ফেরানো দরকার হয়েছে—অনেক খারাপ খারাপ অসুখের বীজ দেওয়ালে দেওয়ালে বসে গেছে।

দেখবে জয়দা, আমরা এই একঘেয়েমি ছিঁড়ে ফেলব। আমার বিশ্বাস, আমরা সকলে মিলে এই নতুন পৃথিবী দারুণভাবে রেলিশ করব। আমার বাবাদের মতো একা একা নয়।

জয় হাসছিল। হঠাৎ জয় বলল, তোতো, তোমাদের জেনারেশান যা করবে, তোমাদের পরের জেনারেশান যদি সেটাকে আবার বদলে দিতে চায় ? তুমি যখন তোমার বিশ্বাসে ভর করে নিজেকে খইয়ে ফেলার পর দেখতে পাবে তোমার নিজের ছেলে, যার ভাল ভেবে আর যাদের ভাল চেয়ে তোমরা এত সব পরিবর্তন করলে, তারা আবার তোমাদেরই বিশ্বাসের উপর ঘৃণাভরে রুট মার্চ করে যাচ্ছে—তখন কেমন মনে হবে ?

—তখন আমাদের দারুণ আনন্দ হবে জয়দা। আমরা আমাদের ছেলেদের তো বাড়ি দিয়ে যাব না, জমি দিয়ে যাব না, আমরা ওদের মধ্যে একটা বাঁচার তাগিদ সঞ্চারিত করে দিয়ে যাব। ওদের যদি আমাদের রং পছন্দ না হয় তবে ওরা আবার রং বদলাবে। আমার বাবাদের মতো ছেলেদের অবাধ্যতার জন্যে ভেবে ভেবে করোনারী অ্যাটাকে না মরে আমরা ওদের পিঠ চাপড়ে বলব, সাবাস বেটা। ওরা যেন এই পৃথিবীটাকে সব সময় নতুন করে সাজিয়ে রাখে, পুরনো যা কিছু তাকে যেন ওরা লাথি মারে—হোক না তা আমাদের নিজের হাতের তৈরি। আমি যা বলছি এটা ভান নয় জয়দা, এটা আমার বিশ্বাস। আন্তরিক বিশ্বাস।

—তাহলে বিশ্বাস এখনও আছে পৃথিবীতে ?

—বিশ্বাস বললাম, না ? তোতো বলল—হয়তো বিশ্বাস আছে, জানি না। বিশ্বাস আছে কি নেই, এ নিয়ে ভাববার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে।

৩

তোতো গেস্ট হাউসের দিকে চলে গেছে।

জয় পিস্তলটা কাঁধে ঝোলানো হোলস্টারে ফেলে সমুদ্রের পার ধরে হেঁটে আসছিল।

আকাশে তখনও আলো আছে। সমুদ্রের ভাঙা ঢেউয়ে নরম রামধনুর রং ঠিকরে পড়ছে। নুলিয়ারা এখনও নৌকো নিয়ে ফিরছে—যারা দুপুরে নৌকো নিয়ে বেরিয়েছিল তারা। আজ শুধু লাল ভেটকি ধরা পড়েছে। প্রতিটি নৌকোর রং লাল হয়ে গেছে। সন্ধের রং, আকাশের রং, জলের রং, নৌকোর রং সব লালচে দেখাচ্ছে।

জয় হাঁটতে হাঁটতে নুলিয়াদের বস্তির দিকে যাচ্ছিল। সময় পেলে জয় ওদের বস্তির সামনে সমুদ্রের পারে বালিতে উল্টে-রাখা ক্যাটামেরনের উপর বসে ওদের সঙ্গে গল্প করে। কত কিছু জানার আছে, শেখার আছে চন্দ্রাইয়াদের কাছ থেকে—কত কী দেখেছে জীবনে ওরা! গেস্ট হাউসে

BanglaBook.org

ফিরলেই তো সেই একঘেয়ে সঙ্গ, একঘেয়ে গল্প। সেই আড়ষ্ট ভদ্রলোকী।

জয় হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, ভদ্রলোক কাকে বলে ? ওরা কি সত্যিই ভদ্রলোক, না নিজেদের ভদ্র বলে বিশ্বাস করে এসেছে এতদিন ?

এমন সময় সেই বেঁটে নুলিয়াটা, রোজ যাকে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় একটা বেঁটে মোটা শিয়ালের মতো সমুদ্রের পার ধরে তীক্ষ্ণসন্ধানী চোখ ফেলে ফেলে হেঁটে যেতে দেখে—তাকে আসতে দেখল।

লোকটাকে অদ্ভুত লাগে জয়ের। লোকটার যেন সমুদ্রপারের নৌকো, মাছ, সাঁতার-কাটা ছেলেমেয়ে—কারু প্রতিই নজর নেই—নজর থাকে না ; ও যেন ওর চোখ দিয়ে চিরে চিরে কী খোঁজে !

জয়ের সামনে এসেই লোকটা আজ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, বাবু, দেশলাই আছে ?

জয় দেশলাইটা বের করে দিল অন্যমনস্ক ভাবে।

লোকটা দেশলাইটা জ্বালল হাওয়া আড়াল করে। ছোটকঁলু ধরাল।

এমন সময় জয়ের হঠাৎ মনে হল, লোকটা দেশলাইয়ের আগুন, কি বিড়ি, কি অন্য কিছুর দিকেই দেখছে না—লোকটা অপলকে ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে।

জয় অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। লোকটা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, বাবু !

লোকটা যেন কী বলতে গেল, কিন্তু ভয়ে বা সংকোচে যেন কথাটা বলতে পারল না।

দেশলাইটা ওর হাতে ফেরত দিয়ে লোকটা সেই না-বলা কথাটা বয়ে নিয়ে ব্যাকওয়াটারের দিকে চলে গেল। একটা খোঁড়া শিয়ালের মতো আস্তে আস্তে চলে গেল।

লাইটহাউসের বাতিটা জ্বলে উঠেছে। বাতিটা এখন থেকে সকাল অবধি চক্রাকারে ঘুরবে। আলো আর অন্ধকারের আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে সমুদ্র। ঝাউ আর কাজুবাদামের বন, দূরের বালিয়াড়ি, সমুদ্রপারে ফেলে-রাখা কালো কালো ক্যাটামেরনগুলো, ঝাউবনের পাশে বালির উপর একলা দাঁড়িয়ে-থাকা পাতায় ছাওয়া মাছের ঘর ; সব কিছু।

একটু পরেই সমুদ্র আর সমুদ্রপারে ঘন অন্ধকার নেমে আসবে। হুহু করবে হাওয়াটা। গুরুম গুরুম করে ঢেউ ভাঙার শব্দগুলো হাওয়ায় ভেসে এসে আছড়ে পড়বে গেস্ট হাউসের ঘরে ঘরে। ঝাউবনের শিস উঠবে শিঁ শিঁ করে।

চন্দ্রাইয়াদের বস্তি বেশ খানিকটা দূর গেস্ট হাউস থেকে।

প্রথম দিন এসে সকালে ঘুরতে বেরিয়েছিল জয়, ঘুরতে ঘুরতে এই ঝাউবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ঝাউবনের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত নিচু লাইটহাউস আছে। লাইটহাউসটার উপরে উঠে সমুদ্র আর চারদিকে কেমন দেখায় ভেবে জয় আস্তে আস্তে মিহি বালি-ভরা ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে তার উপরে উঠেছিল। উঠেই দেখতে পেয়েছিল, একটা বিরাট সামুদ্রিক বাজপাখি তার মাথায় বসে আছে। জয় যেদিক থেকে এসেছিল সেদিক থেকে পাখিটাকে দেখা যাচ্ছিল না। ওকে উপরে উঠতে দেখে পাখিটা কয়েক সেকেন্ড কী করবে ভেবে না পেয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। জয় দেখেছিল, পাখিটার একটা চোখ কানা। বাজটা অত কাছে ওকে দেখা সত্ত্বেও চুপ করে বসে থেকেছিল। তবুও উড়ে যায়নি।

তখন থেকে যখনই এই পথ দিয়ে গেছে জয়, একবার করে দেখে গেছে বাজটা বসে আছে কি-না। আশ্চর্য, যখন ও এসেছে— সকালে কি দুপুরে, ও দেখেছে পাখিটা অমনি চুপ করে সমুদ্রের দিকে এক চোখে চেয়ে বসে আছে। ঠোঁটে কোনও আওয়াজ নেই। একটিমাত্র চোখ পলকহীন, ডানা নিস্পন্দ, মুখ শান্ত। বাজটা কত যুগ ধরে যেন কী ভাবছে ! সমুদ্রের সব ঢেউ ও গুনে ফেলেছে। তবু ওর অঙ্ক মিলছে না। কী এক দারুণ ভাবনা মাথায় নিয়ে ও বোধিলাভের বাসনায় এই উঁচু আসনে বসে সাধনা করছে— রোদে, জলে, চাঁদে, অন্ধকারে। বুড়ো বাজটা ওর স্থির অনড় বিশ্বাসে স্থবির হয়ে গেছে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল।

চন্দ্রাইয়াদের বস্তির পাতায় ছাওয়া ঘরের আড়ালে আড়ালে লণ্ঠনের আলো মিটমিট করে

BanglaBook.org

জ্বলছিল। লাইটহাউসের আলোটা ওদের বস্তির উপরেও ঘুরে যাচ্ছে চক্রাকারে, কিন্তু এত দূরে বস্তিটা যে ওখানে গিয়ে জলো দুধের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায় আলোটা। আশ্চর্য ঘোলাটে দেখায়।

চন্দ্রাইয়া আর রামাইয়া বালিতে ফেলে-রাখা ক্যাটামেরনের পাশে বালিতে উবু হয়ে, দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ ঠেকিয়ে বসেছিল। জয়কে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আসুন বাবু।

জয় বলল, বস্তিতে এত সোরগোল কীসের আজ ?

—আর ক'দিন বাদে আমাদের যাত্রা হবে, মেলা হবে ; তারই তোড়জোড় চলছে।

—কীসের যাত্রা ?

—পুজো হবে না ? মুত্তেলামা আর টোটম্মা আমাদের দুই দেবী। তাঁদের পুজো হবে। মুত্তেলামা আর টোটম্মার ছোট ছোট সাদা সাদা মন্দির আছে গ্রামে ঢোকার আগে পাহাড়ের উপর, দেখেননি ? ওঁরা দু' বোন।

রাতে পথে পথে যাত্রা ঘুরবে— কত মজার সাজ হবে—মেয়েরা সব সেজেগুজে সারারাত হই-হই করে বেড়াবে। আলো জ্বলবে, বাজনা বাজবে। এ সময়টা আমাদের পরবের সময়।

—মুত্তেলামা আর টোটম্মা কি সমুদ্রের দেবতা ? জয় শুধোল।

—না। আসলে সমুদ্রের দেবতা অশাণ্ডিমারু। জানেন বাবু, শীতকালে যখন সমুদ্র শান্ত থাকে নীল দেখায় জল ; তখন ক্যাটামেরন নিয়ে সমুদ্রের গভীরে চলে গেলে দেখা যায় জলের নীচে একটা পাহাড়। জলের নীচ তখন কাঁচের মতো পরিষ্কার দেখায়। সেই জলের নীচের পাহাড়ের গায়ে অশাণ্ডিমারুর থান। সেই শ্যাওলা-ধরা কালো পাহাড়ের চারপাশে লক্ষ লক্ষ স্যামন আর সার্ডিনের এক-একটা বড় বড় ঝাঁক পাখনা নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়ায়। সবুজ জলের উপর দিয়ে শীতের হলুদ রোদ এসে বেঁকে পড়ে ওদের গায়ে। কখনও-সখনও টাইগার শার্ক নিঃশব্দে প্রচণ্ড বেগে এসে স্যামন আর সার্ডিনের ঝাঁককে তাড়া করে— তারপর সেই রুপোর চাদরের মতো মাছের ঝাঁক টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে চারধারে ছড়িয়ে যায়। দেখবার মতো জিনিস বাবু। এখন শীতকালে আসুন, নিয়ে যাব।

জয় বলল, তুমি কোন দেবতাকে সবচেয়ে বেশি মানো ? অশাণ্ডিমারু ?

চন্দ্রাইয়া হাসল। তারপর জয়ের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল, আমি কোনও ভগবান মানি না।

জয় বলল, সে কী ? তুমি নুলিয়া, তোমরা সব সময়ে জলে কাটাও, বর্ষায় গ্রীষ্মে সমুদ্রে নৌকো নিয়ে মাছ ধরে বেড়াও, লোককে সাঁতার কাটাও, আর তুমি ভগবান মানো না কী রকম ?

চন্দ্রাইয়া চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল, কেউ ওর কথা শুনছে কিনা, তারপর একটা ছোটকঁলু ধরিয়ে বলল, ভগবান মানতাম বাবু—কিন্তু তিনকুড়ি বয়স হয়ে গেল, এখন মনে হয় ভগবান নেই। ভগবান থাকলেও ভগবান কালা।

—কেন ? ভগবানকে তুমি কিছু বলেছিলে ?

চন্দ্রাইয়া ওর কালো মুখের ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল ; বলল, ভগবানকে কিছু বলেনি এমন লোক আছে নাকি ? বলেছিলাম, অনেক করে বলেছিলাম, কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম। ভগবানে বিশ্বাস করেছিলাম। এখন আর করি না।

—কি, বলেছিলে কী ?

—শুনে কী লাভ ?

—তবু বলোই না শুনি ?

—বলেছিলাম যে, সারা জীবন পরের নৌকো ভাড়া করে মাছ ধরে আর গেস্ট হাউসের লোকদের চান করিয়ে যা রোজগার করব তা থেকে খাওয়া-পরার খরচ বাদ দিয়ে যেন জীবনে কখনও সাড়ে তিনশো টাকা জমিয়ে ফেলতে পারি।

—সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে তুমি কী করবে ?

—সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে আমি আমার একটা নিজের ক্যাটামেরন কিনতাম— আমার নিজের নৌকো।

BanglaBook.org

মহাজনের নৌকো ভাড়া করে সারাদিন মৃত্যুর সঙ্গে, ঢেউয়ের সঙ্গে, রোদের সঙ্গে লড়ে যা মাছ পাই তার প্রায় সবই চলে যায় মহাজনের নৌকোর ভাড়া গুনতে। নিজের থাকে না কিছুই। মাঝে মাঝে নিজের উপর ঘেন্না হয়।

ভগবান থাকলে এমন হয়? এমন হত? সারা জীবনে আর কিছু চাইনি। তুমি তো দেখেছ বাবু, কী আমরা খাই, কী আমরা পরি। আমি শুধু চেয়েছিলাম ঝকঝকে সমুদ্রের বুকে আমার নিজের নৌকোয় দাঁড়িয়ে আমি দাঁড় বাইব, আমি মাছ ধরব, নিজের নৌকো থেকে বার বার ঢেউয়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে আবার জল সাঁতরে গিয়ে ঢেউয়ের উপর পালিয়ে যাওয়া নৌকোটাকে জড়িয়ে ধরব; ধরে বলব, শালা তুই আমার, তুই আমার, তুই পালাবি কোথায়?

বলেই চন্দ্রাইয়া চুপ করে গেল। তারপর বলল, নাঃ বাবু, ভগবান নেই।

জয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে যদি আমি সাড়ে তিনশো টাকা জোগাড় করে দিই?

—জোগাড় করে দিই মানে?

—মনে করো যদি তোমাকে কেউ টাকাটা দিয়েই দেয় একেবারে?

চন্দ্রাইয়া ছোটকঁলুতে একটা বড় টান দিয়ে ঘুরে বসল জয়ের দিকে। বলল, মানে? দান করে দেবে বাবু কেউ?

ওর কুচকুচে কালো মুখে ছোটকঁলুর আগুনের আঁচ লাগল।

জয় বলল, হ্যাঁ, যদি কেউ দানই করে দেয়!

চন্দ্রাইয়াকে খুব বিষণ্ণ দেখাল সেই অন্ধকারেও। ও বালিতে উপুড় করে রাখা পাশের ক্যাটামেরনের উপর বসে পড়ে বলল, না বাবু, আমরা মেহনতের টাকা ছাড়া কিছু নেই না।

তারপর চন্দ্রাইয়া ওদের মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের বস্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে সামনের বাড়িটার বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোর তলায় একটা লাল শাড়ি পরা মেয়েকে দেখছেন, ওর নাম লছমামা। ওর ছোকরা বরও একজন নুলিয়া ছিল। ভোরবেলা পোকাল ভাত আর তেঁতুলের জল খেয়ে আমাদেরই আর সকলের মতো ও মাছ ধরতে যেত, মেহনত করত। ও গত বছর হঠাৎ লটারিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে গেল। ব্যস, শালাকে রাতারাতি মহাজনদের সব গুণে পেয়ে বসল।

ও শহরের সমুদ্রে চাঁদির ক্যাটামেরন চড়ে এখন সহজ সুখের মাছ ধরে। ও নিজে খাটে না, টাকা খাটে ওর জন্যে। শহরে ও বাড়ি কিনেছে, ওর ইয়াব্বড় ভুঁড়ি হয়েছে। ওর আজকাল হজম হয় না, ও রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমায়।

জীবনে সহজে সবকিছু পেয়ে গিয়ে সারাদিন কষ্ট করার পর শুধু পোকাল আর শুঁটকি মাছ খাবার যে আনন্দ তা ও ভুলে গেছে। ও ভেবেছিল, টাকা পেলে ও সব পাবে। লটারির টাকা ও পেয়েছে ঠিক, কিন্তু টাকাই পেয়েছে—জীবন থেকে আর সবকিছু ওর চলে গেছে। লছমামাকে ও ছেড়ে দিয়েছে। ও শালার টাকার এমনই মোহ যে, লছমামার খোরপোষের টাকা পর্যন্ত ও পাঠায় না। লছমামা কী করে পেট চালাচ্ছে সে আমিই জানি, আর কেউ নাই বা জানল।

এই অবধি বলে চন্দ্রাইয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর হঠাৎ বলল, নিজে মেহনত করে যা না পাওয়া যায় বাবু, তার কোনও মজা নেই, তা পাওয়া না-পাওয়া সমান।

কিছুক্ষণ ওরা দু'জনে চুপচাপ বসে রইল।

জয় বলল, এটা তোমার বাড়াবাড়ি। টাকাটা তুমি না হয় ধার হিসেবেই নিলে, পরে না হয় শোধ করে দিয়ো।

—তা হয় না বাবু। আমাকে বস্তির ওরা সকলে মানে। আমি নিজের রোজগার থেকে জমিয়ে যদি কিনতে পারতাম একটা ক্যাটামেরন তো অন্য কথা। আমি একা ধার নিতে পারি না। আমরা তিরিশ জন আছি—দেবেন আপনি তিরিশ জনকে সাড়ে তিনশো করে টাকা? তিন মাসে আপনার টাকা শোধ করে দেব কথা দিচ্ছি। কিংবা কারও কাছ থেকে জোগাড় করে দিন টাকাটা। সকলের জন্যে। পারবেন বাবু?

জয় চুপ করে থাকল।

BanglaBook.org

চন্দ্রাইয়া আবার ওর সাদা দাঁত বের করে হাসল, বলল, কিছুদিন আগে একজন বাবু এসেছিল মাড্রাস থেকে। ব্যাঙ্কের মালিক। তাঁকেও বলেছিলাম—এই ধারের কথা। বলেছিলাম, আপনার ব্যাঙ্কে আমাদের ইজ্জত বন্ধক রাখছি, বলেন তো আমাদের বউ-মেয়েদেরও বন্ধক রাখতে রাজি আছি। আর কিছু তো আমাদের নেই বন্ধক রাখার মতো, বদলে আমাদের বস্তির তিরিশ জনকে টাকাটা দিন—আমরা ছ' মাসে শোধ করে দেব।

ব্যাঙ্কের বাবু হেসেছিলেন, বলেছিলেন, চন্দ্রাইয়া, তুই একটা পাগল। আমার ব্যাঙ্ক তো তোর জন্যে ক্যাটামেরনের মতো ডুবতে পারে না। যার টাকা আছে— টাকা দেখিয়ে একমাত্র সে-ই শুধু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেতে পারে। এখন কি রামায়ণের যুগ আছে যে ইজ্জত বাঁধা রেখে, বউ বাঁধা রেখে টাকা পাবি ?

জয় কোনও কথা বলল না। চুপ করে রইল।

চন্দ্রাইয়াদের বস্তির মধ্যের উঠোনে রঙিন কাপড় জোড়া দিয়ে দিয়ে ওরা যাত্রার বিরাট ঘোড়ার পোশাক বানাচ্ছিল। মুত্তেলামা আর টোটম্মার যাত্রার দিন ওরা ঘোড়া সাজবে, বাইসন সাজবে, নানারকম সং সাজবে— তারই নানারকম তোড়জোড় চলেছে।

ন্যাংটো ছেলেমেয়েগুলো আলোর চারদিকে পোকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের ভাষা কিছু বোঝা যায় না— শুধু ওদের চোখের ভাষা ছাড়া। ছেলে বুড়ো প্রত্যেকের চোখেই একটা দারুণ আনন্দ আর উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। আর চার-পাঁচদিন পরই দারুণ আনন্দের দিন। সকলে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে।

কিছুক্ষণ পর চন্দ্রাইয়া বলল, কী বাবু, রাগ করলে ?

জয় উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়ল।

চন্দ্রাইয়া বলল, আমি জানি, তুমি অন্য রকম, নইলে তুমি আমার মতো একজন বুড়ো নুলিয়ার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করে সময় নষ্ট করবে কেন ? আমাদের বস্তিতেই বা এতবার আসবে কেন ? আমি জানি, তবু তোমাকে যা বললাম তা তোমাদের সকলের জানা উচিত—তাই বললাম। এত কথা শোনার সময় তো সকলের হয় না। তুমি শুনলে, তাই বললাম। তোমরা এখানের সমুদ্রে নেমে যেমন ঢেউয়ে হাবুডুবু খাও, তেমনি আমরাও তোমাদের কাছে গেলে অমনি হাবুডুবু খাই। সমুদ্রকে ভয় করার কিছু নেই। তোমরা ভয় পাও কারণ তোমরা ঢেউয়ের মন বোঝো না। আমরাও তোমাদের ভয় পাই কারণ আমরা তোমাদের মন বুঝি না।

জয় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ওখানে। জোলো হাওয়ায় গা ম্যাজম্যাজ করছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ন'টা বেজে গেছে। এবার না উঠলে ডিনারের সময় পেরিয়ে যাবে। বালিতে হেঁটে যেতেও প্রায় আধ ঘণ্টা লাগবে।

জয় উঠে দাঁড়াল। বলল, চলি চন্দ্রাইয়া।

চন্দ্রাইয়াও উঠে দাঁড়াল। বলল, চলো বাবু, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

অন্ধকারে চলতে চলতে চন্দ্রাইয়া হাত বাড়িয়ে বলল, একটা ছোটকঁলু খাও বাবু।

জয় দাঁড়িয়ে পড়ে হাওয়া আড়াল করে দেশলাই জ্বেলে ছোটকঁলুটা ধরাল। ওরা যত এগুতে লাগল লাইটহাউসের আলোটা তত জোর হতে লাগল। আলোটা চক্রাকারে ঘুরছে— আলো অন্ধকার, অন্ধকার আলো, নির্ভুল গতিতে ঘুরে ঘুরে আসছে।

বালিয়াড়ির মধ্যের বড় ঝাউবনটার পাশ দিয়ে আসবার সময় ঝাউবনের মধ্যে থেকে হঠাৎ কী একটা ঝট্‌পট্‌ শব্দ শুনে ওরা দু'জনে থমকে দাঁড়াল।

চন্দ্রাইয়া ওদিকে ফিরে খানিকটা আপনমনেই অন্ধকারে কাকে যেন উদ্দেশ করে বলল, কী বুড়ো ? মাছ পাসনি ? পাবি পাবি, কাল ভোরে পাবি।

জয় তাকিয়ে দেখল, ওরা ঝাউবনের মধ্যের সেই ভাঙা লাইটহাউসটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লাইটহাউসের উপরে সেই অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় একটা অন্ধকারতর ছায়া তার মাথায় বসে আছে।

চন্দ্রাইয়া বলল, বুড়ো বাজ আছে ওখানে একটা। রোজ সকালে আমরা ওকে মাছ খাওয়াই।

BanglaBook.org

—কেন ? ও উড়তে পারে না ? জয় শুধোল।

—উড়তে পারে। ডানাও আছে। অসুখও নেই। অথচ আশ্চর্য, বহুদিন থেকে দেখছি ও কখনও ওড়ে না ! দূরে যায় না উড়ে, ঝড় জল রোদ সব ওর মাথার উপর দিয়ে বয়ে যায়। চার-চারটে সাইক্লোনের অত্যাচার ও অমনি বসে বসে সহ্য করে গেল।

আমরা ঝাউবনের সামনে মাছ ফেলে দিয়ে যাই। ও এইটুকু উড়ে এসে মাছ খায় ; আবার উড়ে গিয়ে বসে। পাখিটা কানা।

জয় বলল, আমিও একদিন দেখেছি পাখিটাকে ; ওকে দেখলে মনে হয়, ও যেন সব সময়ই কী ভাবে ! কী এত ভাবে পাখিটা ?

চন্দ্রাইয়া হাসল। বলল, আমারও তাই মনে হয়। আমাদের দয়ায় ও বেঁচে আছে বলে ওর খুব লজ্জা, অথচ ও এই বাতিঘরের আরাম ছেড়ে কোথাও উড়ে যাবার সাহস রাখে না। তাই বোধ হয় ও সব সময় ভাবে, ওর কী করা উচিত। যদি কখনও ওড়ে তো কোনদিকে ওড়া উচিত।

আমাদের বস্তির ছোকরাগুলো প্রায়ই বলে, ওকে আর মাছ দিয়ো না। ও শালা একটা বুড়ো, সেকেলে অপদার্থ। নিজের নখ, নিজের ঠোঁট, নিজের শক্ত ডানা ও কোনওদিন কাজে লাগাল না। ওর বাঁচার কোনও অধিকার নেই। ও শালা না খেয়েই মরুক।

আমরা বুড়োরা হাসি ছোকরাদের কথা শুনে। ওদের বলি যে, বুড়োরা ওইরকমই হয়, যৌবন পেরিয়ে এসে আমরা সকলেই ওরকমই ভাবি, আমাদের সকলের চোখেই ঘুম জড়িয়ে গেছে—ভাবনায় আমাদের মগজ ছেয়ে গেছে মাকড়সার জালের মতো। বাজটা আমাদেরই মতো। আমরা যে ক'দিন বেঁচে আছি, ওকেও বাঁচিয়ে রাখিস। আমরা না থাকলে তোদের যা খুশি করিস।

জয় হাসল। চন্দ্রাইয়াও হাসল।

চন্দ্রাইয়া বলল, আমরা ওর নাম রেখেছি— 'খুব পুরনো'।

জয় বলল, ওর নামটা খুব পুরনো বুঝি ?

চন্দ্রাইয়া বলল, না না, ওর নামই 'খুব পুরনো'।

৪

আমার নাম জয় চ্যাটার্জি।

আমি একা।

আমি একজন নিছক নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তি। আমি বরাবর আমাকে নিজেকে নিয়ে সুখী ছিলাম, সুখে ছিলাম। আমি পৃথিবীর সব কিছুতে নিঃশেষে বিশ্বাস করেছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম, জীবন একটি সুন্দর হিরে-বসানো অভিজ্ঞতা ; ভেবেছিলাম—আন্তরিকভাবে ভেবেছিলাম যে, জীবনে যা দেওয়া যায় তাই-ই ফেরত পাওয়া যায়। যতটুকু দেওয়া যায় ততটুকুই পাওয়া যায়। তাই আমি কিছুমাত্র বাকি না রেখেই আমার নগণ্য অল্প বয়সের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমার যা কিছু দেবার ছিল নিঃশেষে দিয়ে দিয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম, কিছুই বাকি না রেখে সব দিয়েছি বলে ফেরত পাবার বেলাতেও আমি অনেক বুঝি ফেরত পাব।

আমি একটি মেয়েকে আমার যা-কিছু ছিল সব কিছু দিয়ে ভালবেসেছিলাম।

ভালবাসা বলতে কী বোঝায় তা জানি না। কেউ জানে বলেও আমার জানা নেই। তবু শীতের শান্ত দুপুরের রোদের মতো, বিকেলের কাকের নরম করুণ গ্রীবার বিষণ্ণতার মতো আমি একটি ছিপছিপে মেয়ের শরীর ও মনের নরম লাজুক উষ্ণতা চেয়েছিলাম। তার শরীর, তার চোখের তারায় স্পন্দিত আলোর জন্যে কাঙালপনা করেছিলাম।

আমি ভেবেছিলাম, আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে, মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই বাঁচে না। ভেবেছিলাম প্রত্যেকটি মানুষের নিজের নিজের জীবনে বাঁচার কয়েকটি শর্ত থাকে হয়তো। আমি শুধু তাকে ভালবাসার জন্যেই বাঁচব।

অনবধানে, মনে মনে, কখন যে এই ভাবনা আমার বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে গেছিল তা আমি

BanglaBook.org

বুঝতে পারিনি। একদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, আমি বিশ্বাসে বিশ্বাস করে ফেলেছি। আমি বিশ্বাস করে ফেলেছি যে, কাউকে তেমন করে ভালবাসলে সে ভালবাসা নিশ্চয়ই ফেরত পাওয়া যায়।

আমি কখনও ভাবিনি যে, আমার এই দারুণ বিশ্বাসের ঘরের চন্দনকাঠের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, বাইরের অবিশ্বাসী পৃথিবীর ঘোলা আবিল আকাশে আমাকে কোনওদিন সংশয়াকুল চোখে তাকাতে হবে। এখানে বেড়াতে এসে, এই মিসেস স্টেইনের গেস্ট হাউসের বিছানায় শুয়ে, রাতের অন্ধকারে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমি আমার বিশ্বাসের অস্তিত্ব ও সত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হব, তা আমি কখনও ভাবিনি।

মেয়েটি, মানে আমি যাকে ভালবেসেছি তার নাম সীমন্তী। আমি তাকে সীমা বলে ডাকতাম।

সে জাস্ট একটি মেয়ে। একটি অত্যন্ত সাধারণ আবরণের মধ্যে সে একটি অসাধারণ মেয়ে। অসাধারণ তার বুদ্ধি, অসাধারণ তার ভালবাসা পাবার ক্ষমতা, অসাধারণ তার ঔদাসীন্য এবং অসাধারণ তার হৃদয়হীনতা। অথচ আপাতদৃষ্টিতে সে আজকে কলকাতার একজন এলেবেলে মেয়ে— তাকে বাসে কিংবা গাড়িতে কি য়্যুনিভার্সিটির কমনরুমে দেখে অন্য মেয়েদের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করবার কোনও কারণ ঘটবে না।

তবু তার সমস্ত গুণ, সমস্ত দোষ, তার অসাধারণ সাধারণতা, তার জেদ, তার বিচ্ছিরি দাঁত, তার খারাপ মেজাজ সত্ত্বেও তাকে আমি ভালবেসেছিলাম।

তার সঙ্গে আমার ডেট ছিল প্রত্যেক বুধবার। আমি জানতাম শনিবারের রয়্যাল ডেটিং ও জোজোর জন্যে রাখত।

জোজোর সঙ্গে ও স্টেডি যাচ্ছিল।

অনেক সপ্তাহে বুধবারের আগে ও ফোন করে আমাকে বলত, কাল আসতে পারব না, বাড়িতে পিসি আসবে অথবা দাদার ছেলের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ ইত্যাদি। আমি জানতাম, আমার ডেট ও রাখতে না পারলেও শনিবারের ডেট ও ফেইল করবে না—জোজোর সঙ্গে।

মাঝে মাঝে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতাম—নিজের গালে নিজে চড় মারতাম, নিজের গোড়ালি দিয়ে নিজের পেছনে লাথি মারতাম। বুঝতে চেষ্টা করতাম, জোজো আমার চেয়ে কত কিলোগ্রাম বেশি ভাল। কী বাবদে ভাল।

আশ্চর্য, আমার সঙ্গে সীমা যখন কোনও সিনেমায় যেত বা কোথাও খেতে যেত, তখন কিন্তু ওকে দেখে মনে হত, আমাকে নইলে ওর জীবন বৃথা হবে!

এমন করে তাকাত ও, এমন অস্ফুটে কথা বলত, এমন বৃষ্টিশেষের রোদের মতো হাসত যে আমি তাই-ই ভাবতাম। আমি জানতাম যে, যাই করুক ও, যাই ঘটুক, একদিন—সেই শেষের দিনে ও আমার বুকে ফিরে আসবেই; জোজোকে ও কোনওভাবে জানিয়ে দেবেই,— "মোর তরে যদি কেউ প্রতীক্ষিয়া থাকে সেই ধন্য করিবে আমাকে।"

আমি ওর জন্য নিজেকে একটি নিষ্কলঙ্ক ফুলের মতো পবিত্র রেখেছিলাম। আমার মন, আমার শরীর।

মেয়েরা যেমন করে ভাবে, আমিও তেমনি বাড়াবাড়ি গোঁড়ামিতে ভাবতাম—ভাবতাম এমন না করলে আমার কর্তব্যে অবহেলা হবে। আমি অসৎ হলে ওর কাছে আমি ছোট হয়ে যাব।

জোজোকে আমি পছন্দ করতাম না, কারণ ওর মধ্যে কী যেন কী একটা সস্তা সস্তা ব্যাপার ছিল। বটতলার বইয়ের মতো, চীনে দোকানের জুতোর মতো ওর বাইরের মলাটের সুগন্ধ ছাপিয়ে একটা বমি-বমি দুর্গন্ধ পেতাম। ওর ফ্ল্যাশ খেলা, ওর ঘড়ি-পরা ডানহাতে সিগারেটের প্যাকেট, ওর হামবড়াই ভাব, ওর শুয়োরের দলের মতো রাস্তায় বেড়ানো বন্ধুর দল, ওর কথায় কথায় কাঁধ ঝাঁকানো, পাওয়ারলেস চশমার ফাঁক দিয়ে রামছাগলের নির্বুদ্ধিতায় অথচ ধূর্তও রাসেলের মতো মুখ করে তাকানো—এসব আমি ঘেয়ো-কুকুরের গায়ের ঘায়ের মতো ঘেন্না করতাম।

কিছুদিন আগে এক শনিবার সিনেমা দেখে ফিরছি আমার এক বন্ধুর গাড়িতে, ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে আসছি—একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, হাওয়াতে গা শির শির করছে, এমন সময় একটা ট্যাক্সি বন্ধুর গাড়ির গা ঘেঁষে এগিয়ে গেল সামনে।

BanglaBook.org

আমার বন্ধুর গাড়ির হেডলাইটে হঠাৎ বিদ্যুতের আলোর মতো একঝলক দেখলাম, জোজো আর আমার সীমা ট্যাক্সিতে জড়াজড়ি করে চুমু খাচ্ছে।

বন্ধু হেডলাইটটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, নুইসেন্স।

আমার মাথার মধ্যে কী হচ্ছিল জানি না ; আমি কোনওরকমে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করে বললাম, তোর মতো সকলেরই তো গাড়ি নেই। যাদের গাড়ি নেই তারা ট্যাক্সি চড়বেই।

—ট্যাক্সি চড়ার কথা হচ্ছে না। কথাটা রুচির। এসব মেয়েদের সঙ্গে প্রস্টিট্যুটদের কোনও তফাত নেই। প্রস্টিট্যুটও হতে পারে।

আমি বললাম, এটা তোর অন্যায়। এ মেয়েটি তো ভালও হতে পারে। ওরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসে।

ও বলল, থাম তো, ভালবাসার কী ছিরি ! আয়না ঘুরিয়ে ট্যাক্সিতে বসে বেলেল্লাপনা না করলে বুঝি ভালবাসা হয় না !

আমি বললাম, তুই ব্যাপারটা বুঝিস না। কী করবে বল ? কলকাতায় নির্জনতা কোথায় ?

ও বলল, তুই বাজে তর্ক করছিস।

আমি চুপ করে গেলাম।

তার পরের বুধবার সীমা আমার সঙ্গে বেরোতে পারল না। জানাল, অসুবিধা আছে। তার পরের বুধবারও না।

এবং তার পরে কোনওদিনও না।

তারপর বহুদিন পর একদিন আমি সকালবেলা ওদের বাড়ি গেছিলাম।

দোতলাতে ওর ঘরে ও একটা সাধারণ শাড়ি পরে না সেজেগুজে এক বান্ধবীর সঙ্গে শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল। আমি যেতেই আমাকে ও বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তারপর আমরা আধ ঘণ্টাখানেক গল্প করলাম – মামারকম কথা, সে-সব কথার কোনও মানে হয় না।

ওইখানে বসে থাকতে থাকতেই আমার হঠাৎ ট্যাক্সিতে দেখা ওদের দু'জনের কথা মনে হল। আমি মুখ ফুটে ওকে সেদিনের কথা কিছুতেই বলতে পারলাম না, তাছাড়া সে কথা বলার কথাও নয়।

আমি ভগবান নই, আমিও একজন রক্তমাংসের মানুষ। আমাকে যা ও কোনওদিন দেয়নি তা ও জোজোকে অমন অবহেলায় দেয়, এই কথা ভেবেই আমার শির দপদপ করতে লাগল। তাছাড়া মনে পড়ল, ও আজকাল যখন-তখন বিনা কারণে আমাকে মিথ্যা কথা বলে। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম, সব কিছুর একটা সীমা আছে—আমার অপেক্ষার, ওর চাতুরীর, আমার সংযমেরও।

ওর বান্ধবী চলে গেল। তাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেই ও বলল, কী খাবে বলো ?

আমি বললাম, চুমু খাব।

ও বলল, ডোন্ট বী সিলি ! বলো না কী খাবে ? চা, না কফি ?

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম, আমি সিরিয়াস্‌লি বলছি, তোমাকে চুমু খাব।

ও একটু সরে গিয়ে বলল, এই, কী হচ্ছে কী ? এখানে বোসো।

তারপর বাধো বাধো গলায় বলল, কথাটা তোমাকে জানানো দরকার, আমি আর জোজো, মানে উই টু আর গেটিং ম্যারেড। বুঝতেই পারছ, আমি এখন সর্ট অফ পরস্ত্রী।

কিন্তু সত্যি, আই অ্যাম রিয়ালি গ্রেটফুল টু য়্যু ফর অল দ্য ফান্ উই হ্যাড টুগেদার। দ্য ওয়ান্ডারফুল টাইম, দ্য গুড ফুড—অ্যাণ্ড অল দ্যাট।

আবার বলল, বোসো, বোসো। কী খাবে বলো ? চা, না কফি ?

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে।

জোজোর সঙ্গে এখনও সে মেয়ে ঘর বাঁধেনি।

ইদানীং তাকে ফোন করলে সে বিরক্ত হয়েছে, চিঠি লিখলে জবাব দেয়নি। তার চলা, বলা,

BanglaBook.org

চোখ চাওয়ায় কেমন যেন একটা সবজান্তা-সবজান্তা ভাব ফুটে উঠেছে। সে ধরেই নিয়েছে, পৃথিবীর সব সুখ বিয়ের দিনে সে গডরেজের আলমারিতে তালাবন্ধ করে রেখে দেবে। তারপর যখন যেমন খুশি, তেঁতুলের আচারের মতো একটু একটু করে বাইরে বের করবে আর চেখে চেখে খাবে।

আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু প্রায়ই বলেন, পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই, ভালবাসা বলে কিছু নেই, বিশ্বাস বলে কিছু নেই। যা আছে তা নিছক রয়্যালটি। কিছু চটুল ডায়ালগ, হুইস্কির নেশার মতো কিছুক্ষণের নেশাগ্রস্ততা, তারপরই সব ফাঁকি— ভোঁ-ভাঁ। আর কিছুই থাকে না, যা থাকে তা রয়্যালটি। মিথ্যা আবেগ, বানানো গল্প, করুণ কল্পনার প্রেম দিয়ে গেঁথে তোলা এক একটি ভারী ভারী বই—ভাল বিক্রি হলে দেদার রয়্যালটি।

যদি তাই হত, রয়্যালটিই যদি সার হত, সত্যিকার ভালবাসা যদি না-ই থাকত, তবে আমি এখনও কেন তাকে ভুলতে পারি না, এখনও একা থাকলেই কেন তার কথা মনে হয়? রাতের অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে কেন তার হাতের স্পর্শ, তার নরম ঋজু থরোথরো বুকের ছোঁয়া, তার ইউক্যালিপটাস গাছের মতো পেলব শরীরের গন্ধ পাই কল্পনায়? কেন তার উজ্জ্বল চোখ দুটি মনে পড়ে বারে বারে? সমুদ্রের শব্দে আমি কেন বারে বারে তার গলার চিকন চিৎকার শুনতে পাই, আকাশের সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে কেন তার প্রশান্ত কপালের কথা মনে পড়ে? কেন?কেন? কেন?

এখনও কেন বোকার মতো মনে হয়, সে একদিন আমার বুকে ফিরে আসবে, একদিন আমার কাছে ফিরে আসবে, একদিন আমার বুকে শেষ বিকেলের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে সুন্দর সী-গালের মতো সমর্পণী গলায় সে বলবে, জয়, আমি তোমার, আমি তোমার, আমি তোমার। তোমার মতো কেউ আমাকে ভালবাসেনি। সব পুরুষই সব মেয়েকে আশ্রয় দেয়, আদর দেয়, সব পুরুষই কম-বেশি রোজগার করে, কিন্তু সব পুরুষ সমান ভাবে ভালবাসতে পারে না— সবাই তোমার মতো বোকার মতো সব কিছু ভুলে নিঃশেষে ভালবাসতে পারে না।

আমি জানি না, কেন আমি আজও তার জন্যে এই হোটেলের ঘরে ফুল সাজাই, সে এলে কোথায় বসবে, কোন শাড়ি পরবে, চুলে কী ফুল গুঁজবে ভেবে আমার সময় কাটে। তার কথা ভাবলে আমার হৃদয় বন্ধ হয়ে যায়; সেখানে একটা নরম রুপোলি সী-গালের ডানা কাঁপে। তার কথা ভাবলে আমার ইচ্ছা হয় আমি ছোট্ট ছেলে হয়ে তার হাত ধরে এই বালুবেলায় আর ঝাউবনে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, উড়ে বেড়াই, দু'হাতে তালি দিয়ে ছোট ছোট পাখিদের ঝাউবন ছাড়িয়ে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে দিই।

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্ন।

পৃথিবীতে মেয়েদের রং-মাখা মুখ আছে, পরচুলা আছে, তাদের হৃদয়ের বদলে স্টক এক্সচেঞ্জের কোটেশান লিস্ট আছে; ছেলেদের উঁচু কলারের জামা আছে, আমেরিকান অ্যাকসেন্টের ইংরিজি আছে, ছুঁচলো জুতো আছে; এগারো ইঞ্চি জুলপি আছে, গুলবাজি আছে, আর যা আছে তা আদি ও অকৃত্রিম রয়্যালটি। শেষ কথা। শেষের রসদ।

আমার মতো যারা সত্যিই ভালবাসে, সে-সব বোকারা বুড়ো ঘোড়ার মতো এই আধুনিক যুগে বাতিল হয়ে গেছে। তাদের যে-কোনওদিন গুলি করে মেরে ফেলা যেতে পারে।

আমি জয় চ্যাটার্জি—আধুনিক যুগে একজন প্রাচীন যুবক আমি। বোকার মতো আমি সত্যি সত্যি একজনকে ভালবেসে ফেলেছি। ভালবাসায় বিশ্বাস করে ফেলেছি।

কিন্তু ভাবি, বোকা আমি, তবু—তবু তো আমি কিছুতে বিশ্বাস করেছি।

বাইরের রাতের সমুদ্র শুধু 'না না' করে আছড়ে মরে। রাতের সমুদ্র সমস্ত প্রশ্নের জবাবে শুধু 'না' জানায়। অন্ধকারে হাওয়াটা অট্টহাসি হাসে আর লাইটহাউসের আলোটা অমোঘ শব্দহীনতায় চক্রাকারে ঘুরে যায়। আলোয় অন্ধকারে, বিশ্বাসে অবিশ্বাসে। গেস্ট হাউসের ঘরে ঘরে। প্রত্যেকের দরজায়। ঝাউবনের সেই 'খুব পুরনো' বাজের একটি মাত্র চোখে।

আমি বিশ্বাসী জয় চ্যাটার্জি—যন্ত্রণায় বিছানায় পাশ ফিরি, আর তুমি পুরনো একচোখো বাজ—রাতের অন্ধকারে যন্ত্রণায় ডানা ঝাপটাও।

BanglaBook.org

তুমিও কি কিছুতে বিশ্বাস করে কষ্ট পেয়েছ, বাজ ? তোমারও কি জীবনের ট্রায়াল ব্যালান্স মেলেনি ?

৫

সেদিন সমুদ্রের পারে বেড়াতে বেড়াতে অনেক রাত হয়ে গেছিল।

সমুদ্রের দিক থেকে গেস্ট হাউসের দিকে এগোল জয়।

গেস্ট হাউসের বারান্দায় আলোগুলো ঝলমল করছিল। সামনের ছোট্ট সবুজ লনটাতে এবং ঘরের সামনে বারান্দায় অনেকে বেতের চেয়ার পেতে বসে আছেন।

মিসেস জেমস্ ও জুডিথের একেবারে শেষের ঘর। ওরা ঘরের সামনে বসে আছে। টেবিলের উপর দুটো ওয়াইন গ্লাস। জুডিথ একটা ট্রানজিস্টর খুলে গান শুনছে। ওদের নিশ্চয়ই খাওয়া হয়ে গেছে।

বারান্দায় ঘণ্টু ঘোষ, হিতেন মিত্তির, তোতো কাউকেই দেখা গেল না। জয় তাড়াতাড়ি ডাইনিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল। অর্ধেক পথ যেতেই ডাইনিং রুম থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল।

ডাইনিং রুমে ঢুকেই জয় দেখতে পেল, ঘণ্টু ঘোষ পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে খুব চিৎকার করে বলছেন, বাট হোয়াই নট ? হোয়াই নট ?

হিতেন মিত্তির ওঁকে ধরে বসালেন, বসিয়ে নিচু গলায় বললেন—অফিসে গিয়ে তো ঝগড়া করে এসেছিস, আর কেন ? বোস, যা এবারে।

ডাইনিং রুমের বেয়ারাগুলো স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ঘষা কাঁচের চশমা-পরা বুড়ো বেয়ারাটা অপরাধীর মতো মুখ করে ওঁদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

তোতোও বসে খাচ্ছিল অন্য টেবিলে।

তোতোর চোখে চোখ পড়তেই তোতো জয়ের দিকে চেয়ে একঝিলিক হেসে চোখ নামিয়ে নিল।

জয় হিতেন মিত্তিরদের টেবিলের কাছে গিয়ে বলল, কী হল ? হলটা কী ?

ঘণ্টু ঘোষ আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় বললেন, বলো তো ভাই, গরিব বলে কি লোকগুলো মানুষ নয় ?

হিতেন মিত্তির, ঘণ্টু ঘোষের পাঞ্জাবির হাতা ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে জয়কে বললেন, জয়, তুমি তোমার টেবিলে যাও। খাও গিয়ে।

জয় নিজের টেবিলে এসে বসল। ন্যাপকিনটার ভাঁজ খুলতে খুলতে আবার ওদের দিকে তাকাল।

ঘণ্টু ঘোষ আজ ডেড ড্রাঙ্ক—আর হিতেন মিত্তির বন্ধুর এই বেসামাল অবস্থার জন্যে খুব এমব্যারাসড ফিল করছেন।

কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে নিশ্চয়ই।

জয় স্যুপ খেতে খেতে তোতোর খাওয়া শেষ হয়ে গেল।

তোতো ওর টেবিল ছেড়ে উঠে আসবার সময় জয়ের টেবিলের সামনে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। ওর টেবিল থেকে একটা টুথপিক তুলতে তুলতে ফিসফিস করে বলল, আপনার মোটা বন্ধু শুধুমাত্র ড্রাঙ্ক হবার পরই সোবার হন। ভেরি ফানি।

বলেই তোতো চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ঘণ্টু ঘোষ খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনটা কোমরে বাঁধা অবস্থাতেই উঠে পড়ে চটি ফটাস ফটাস করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

মিত্তির সাহেব একমনে নিচু হয়ে পুডিং খাচ্ছিলেন। খাওয়া শেষ করে এসে জয়ের টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। পাইপটা পকেট থেকে বের করে ভরতে ভরতে বললেন, কী হে, খুব অবাক হয়ে গেছ তো ?

BanglaBook.org

জয় খেতে খেতে বলল, অবাক হবার কী আছে ? কিন্তু হয়েছিল কী ?

—আর বলো কেন ? ঘণ্টুকে মানা করেছিলাম, অনেক মানা করেছিলাম। শুনল না। সন্ধে থেকে ভডকা খাচ্ছে, উইথ টোমাটো জুস। খাবার টেবলে বসেই যেন অন্যরকম হয়ে গেল। ওই যে চশমা-পরা বুড়ো বেয়ারাটা দেখছ, ও যেই স্যুপ প্লেট নিয়ে এসে টেবলে রাখল, অমনি ঘণ্টু ওকে শুধোল, তুমি কত বছর এ হোটেলে কাজ করছ ?

ও বলল, পঁচিশ বছর।

ঘণ্টু বলল, এটা কী স্যুপ ?

ও বলল, এটা চাইনিজ—চিকেন অ্যাসপারাগাস স্যুপ।

ঘণ্টু বলল, তুমি এই স্যুপ কখনও খেয়েছ ?

ও বলল, না হুজুর।

ঘণ্টু বলল, এই হোটেলে যে-সব খাবার তোমরা রোজ হাতে করে আমাদের সার্ভ করো, তা তোমরা কখনও কিছু খাওনি ?

বেয়ারাটা বলল, না হুজুর, খাইনি।

ঘণ্টু চামচ নামিয়ে রেখে বলল, হাউ স্ট্রেঞ্জ। তোমাদের খাওয়া দেয় না ?

বেয়ারা হাসল, বলল, না হুজুর, আমরা শুখা কাজ করি—খাওয়া পাই না। ওভার-টাইম হলে খাওয়া দেয়—সে তো আমাদের খানা—এসব খানা আমাদের দেখার জন্যে, খাওয়ার জন্যে তো নয়।

—এসব খাওয়া রোজ যে খেতে পারো না তা বুঝি, কিন্তু তোমরা এত বছর কাজ করছ, তোমরা কেউ কোনও দিন নিজেরা চেখেও দেখোনি কেমন খেতে ? কোনও দিনও না ?

বেয়ারাটা চশমার ঘষা কাচের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বলল, না হুজুর।

ব্যস। তখুনি ঘণ্টু বলল, মেমসাহেবকে গিয়ে বলো যে, এই হোটেলের সব বেয়ারা আর বাবুর্চিদের জন্যে কাল আমি দুপুরে এখানে পার্টি দেব। তোমরা কতজন আছ ?

বেয়ারাটি বলল, সবসুদ্ধু তিরিশজন।

—ঠিক হ্যায়। তুমি গিয়ে বলে এসো আমার নামে তিরিশজনের লাঞ্চ বুক করে রাখতে—কালকের জন্যে। যাও।

বেয়ারাটি কী ভাবল কে জানে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে বলল, হবে না হুজুর। মেমসাহেব বললেন, আমরা ডাইনিং রুমে বসে খেতে পারব না। আপনার খাওয়াতে ইচ্ছা হয় তো আমাদের বাইরে কোনও দোকানে খাওয়াতে পারেন। আমাদের এই টেবিল-চেয়ারে বসে খাওয়া বারণ।

—হোয়াট ননসেন্স ! বলে ঘণ্টু লাফিয়ে উঠল। বলল, তোমরা অফ ডিউটির সময়, তোমাদের নিজেদের পোশাকে আসবে—আমি দেখব টেবলে বসে খেতে দেয় কি না। কোথায় তোমাদের মেমসাহেব ? শালী হারামজাদী—আমি দেখছি কেমন না দেয় ! এই বলে ঘণ্টু সোজা উঠে অফিসে চলে গেল। সেখানে তুমুল ঝগড়া।

মিসেস স্টেইন বলল, আপনি যদি এ ব্যাপারে ইনসিস্ট করেন বা বেয়ারাদের জোর করে এখানে খাওয়ান—যে-সব বেয়ারা খেতে আসবে—সে অফ ডিউটির সময়েই হোক আর যে সময়েই হোক—আমি তাদের স্যাক করব। তারপর বলল, আপনি বুঝছেন না মিস্টার ঘোষ, এমন একটা কাণ্ড হলে আমাদের হোটেলের রেসপেক্টেবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে।

ঘণ্টু মারে আর কী ! বলে, হোয়াই ? হোয়াট ইজ দ্যা বিগ ডিসরেসপেক্টেবিলিটি অ্যাবাউট ইট ? হোয়াই নট ? ওরা বেয়ারা বলে কি মানুষ নয় ? দু'বেলা যারা পঁচিশ বছর ধরে হাতে করে খাবার দিচ্ছে, যারা রাঁধছে—যারা টেবল সাজাচ্ছে, চেয়ার সাজাচ্ছে, তারা একদিন টেবিল-চেয়ারে বসে ওই খাবার খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ?

আমি অনেকবার বললাম, ঘণ্টু, সিন-ক্রিয়েট করিসনি।

কে কার কথা শোনে ? ডাইনিং হলে ফিরে এসেও চেঁচাতে লাগল। হোয়াই নট ? হোয়াই নট ?

BanglaBook.org

জয় সবটা শুনে বলল, বাঃ, তবে তো ঘোষ সাহেব ঠিকই বলেছেন ! এটা কত বড় অন্যায় বলুন তো। ভাবলে অবাক লাগে। উনি নিজের পয়সায় খাওয়াবেন, তবুও ওরা খেতে দেবে না ?

মিত্তির সাহেব পাইপটাতে আগুন ধরালেন।

জয়ের মনে হল, পাইপ ধরাতে ধরাতে দেশলাইয়ের আগুনের আভার মতো একটা হাসি ওঁর মুখময় ছড়িয়ে গেল।

জয় বলল, হাসছেন যে ?

—এমনিই !

—না বলুন না, কেন হাসছেন ? জয় জোর করল।

মিত্তির সাহেব বললেন, ঘণ্টু ঠিক বলেনি।

—কেন ?

—কারণ, ও কেবল থিওরিটিক্যালি মহৎ, থিওরিটিক্যালি সোস্যালিস্ট। প্র্যাকটিক্যালি নয়। আমরা কেউই নই। আমরা কোনও কোনও মুহূর্তে সোস্যালিস্ট। তাই এত বড় বড় কথা আমাদের মুখে মানায় না।

জয় বলল, আমি ঠিক একমত হতে পারলাম না আপনার সঙ্গে।

মিত্তির সাহেব আবার হাসলেন, বললেন, আমরা সকলে একই রকম জয়। আমরা হঠাৎ বেজায়গায় সোস্যালিস্ট হয়ে উঠি—অথচ জায়গামতো আমরা কেউই হই না।

জয় একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, তার মানে আপনি বলতে চান আপনার বন্ধু ঘোষ সাহেবের ওই মহত্ত্ব শুধুই ভান, শুধুই একটা পোজ মাত্র !

—সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। মিত্তির সাহেব বললেন।

—আশ্চর্য ! ঘোষ সাহেব আপনাকে বন্ধু বলেই ভাবেন। জয় বলল।

আবার মিত্তির সাহেব এক দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসলেন, বললেন, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে ? চলো বাইরে যাই। একটু হেঁটে আসি। চলো লাইটহাউস অবধি হেঁটে আসি। খাওয়াটা হজম হয়ে যাবে।

জয় বলল, চলুন।

হিতেন মিত্তির আর জয় হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

রাস্তায় আলো জ্বলছে। লাইটহাউসের বাতিটা ঘুরছে। দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাংলোর সামনের কালভার্টে জনাকয় কুচকুচে কালো লোক সাদা গেঞ্জি পরে, কেউ বা খালি গায়ে শুয়ে বসে হাওয়া খাচ্ছে। কেউ কেউ এত রাতেও বসে হাত পা দিয়ে মাকু পাক দিয়ে মাছ-ধরা জাল বুনছে।

হাঁটতে হাঁটতে হিতেন মিত্তির বললেন, তোমার বয়স অল্প, তোমাকে সব কথা বললে তুমি বুঝবে বলে মনে হয় না, তবু শোনো।

ঘণ্টুর সঙ্গে এক ঘরে আছি, তুই-তোকারি করছি, গত তিরিশ বছর ধরে একজনকে চিনছি বলেই যে সে বন্ধু হবে এমন কোনও মানে নেই। ঘণ্টু আমার বন্ধু নয়। ও আমার বহুদিনের পরিচিত, তাই ওর স্ত্রী মারা যাবার পর ওকে একটু সঙ্গ দিই, যখন পারি। ওর জন্যে সত্যিই আমার কষ্ট হয়।

আমি জানি, ঘণ্টুর এই মহৎ প্রস্তাবে আমি সায় দিইনি বলে তুমি অবাক হচ্ছ। কেন আমি সায় দিইনি, তোমাকে খুলেই বলি। হয়তো বলার কোনও দরকার ছিল না। তুমি ভেবো না, আমি নিজেকে জাস্টিফাই করার জন্যে বলছি—সব শুনে তুমিই বোলো আমাকে, আমি সত্যিই ঠিক কি না ?

ঘণ্টুর বাবা নাকি শেষ সময় ঘণ্টুর হাত ধরে বলেছিলেন, বাবা ঘণ্টু, দিনে যদি অন্তত দু'হাজার টাকা কামাতে না পারো, তা হলে জানব যে তুমি আমার যোগ্য পুত্র হলে না।

ঘণ্টু তার বাবার যোগ্য পুত্র হয়েছে। তার বাবার দোকান সে আরও অনেক বড় করেছে। দিনে দু' হাজারেরও অনেক বেশি রোজগার করে ঘণ্টু।

ঘণ্টুর দোকানেও এই হোটেলের মতো অনেক ঘষা কাচের চশমা পরা বেয়ারা আছে। তাদের মধ্যেও হয়তো কেউ আধপেটা খেয়ে থাকে। তাদের অনেকের ছেলেমেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা

BanglaBook.org

গেছে। দু'-পাঁচশো টাকার অভাবে তাদের মেয়েদের বিয়ে হয়নি। তারাও তাদের চশমার ফাঁক দিয়ে নীরব ভাষায় ঘণ্টুকে অনেক আবেদন নিবেদন করেছে—ঘণ্টু তাদের চোখের দিকে তাকাবার সময় পায়নি—ও শুধু টাকা কামিয়েছে আর টাকা জমিয়েছে। ঘণ্টুর কাছে বন্ধুত্ব, ভালবাসা এ-সবের কিছু দাম নেই। ওর ছেলেমেয়ে নেই কোনও। স্ত্রীও মারা গেছেন আজ দশ বছর। তবুও ঘণ্টু সমানে টাকা রোজগার করে চলেছে। ও বিশ্বাস করেছে, এই সমাজে টাকাই সমস্ত আনন্দ, সম্মান ও প্রতিপত্তির উৎস। অতএব ও টাকা রোজগার করছে।

ঘণ্টুর দোকানে আমি সময় পেলে যেতাম আগে আগে। যখন সময় পেতাম, প্র্যাকটিসে নামার প্রথম দিকে।

তখন ওর কর্মচারীরা আমায় চিনত। একবার ওর এক কর্মচারী তাঁর মেয়ের বিয়ের সময় আমার বাড়ি এসে কিছু সাহায্য চান। আমি আমার প্রয়োজনের তুলনায় তখন অনেক বেশি রোজগার করতে শুরু করেছি। আমি তাঁকে এক হাজার টাকা দিয়েছিলাম।

বিয়েতে ভদ্রলোক আমায় নেমন্তন্নও করেছিলেন। গিয়েও ছিলাম।

ভারী সুলক্ষণা মেয়েটি—শুনলাম, ক্লাসে ফার্স্ট হত—গানও গাইত ভাল, কিন্তু পড়াশোনা চালাতে পারলেন না বলে তাড়াতাড়ি মোটামুটি ভাল পাত্র পেয়ে যাওয়ায় বিয়ে দিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

বিয়েবাড়িতে ঘণ্টু যায়নি।

কিন্তু কেউ হয়তো তার কানে তুলে দিয়েছিল আমার যাওয়ার কথাটা।

কিছুদিন পর একদিন হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টু আমার চেম্বারে এসে হাজির।

ওর চোখে-মুখে একটা চাপা উত্তেজনা। ও বলল, আমার সঙ্গে ওর বিশেষ দরকার আছে—আমাকে একবার ওর বাড়ি যেতে হবে, সেখানে ওর এক মামা এসেছেন দেশ থেকে, একটা পার্টিশান স্যুটের কনসালটেশানের জন্যে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে ও। ওপিনিয়ন দিতে হবে।

ওকে দেখেই আমার সন্দেহ হল যে, ব্যাপারটা অন্য। তবু গেলাম।

ঘণ্টু ওর বাড়ি পৌঁছে আমাকে নিয়ে সটান ওর তেতলার শোবার ঘরে উঠে এল। তারপর বলল, কী রে হিতু ? তুই কি খুব বড়লোক মনে করিস নিজেকে ?

আমি বললাম, মানে ?

ও বলল, না হলে তুই কী করে আমাকে ইনসাল্ট করতে সাহস পেলি !

আমি বললাম, ইনসাল্ট কীসের ?

—আমার কর্মচারীকে তার মেয়ের বিয়েতে আমি মাত্র একশো টাকা দিলাম, তাও অ্যাডভান্স হিসাবে—পরে মাইনে থেকে কেটে নেব বলে। আর তুই বড়লোকি দেখাবার জন্যে হাজার টাকা দিয়ে দিলি ?

আমি বললাম, আমি তা জানতাম না—তুই কী দিয়েছিস না দিয়েছিস তাঁর মাইনের এগেইনস্টে। তোর কর্মচারী হিসেবেই ভদ্রলোককে আমি চিনি ; ভদ্রলোকের প্রয়োজন ছিল, আর আমি আমার ক্ষতি না করে সে টাকা দিতে পারতাম বলেই দিয়েছি। তোকে ইনসাল্ট করার কথা মনে আসেনি। তুই এ কথা কী করে ভাবতে পারলি, তাই ভাবছি।

ঘণ্টু রাগে গরগর করছিল। ও বলল, আয়, তোকে একটা জিনিস দেখাব।

এই বলে ঘণ্টু ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দেওয়ালে টাঙানো ওর বাবার অয়েলপেন্টিংটা নামিয়ে ফেলল। দেখলাম, দেওয়ালে ছবির পিছনে একটা সিন্দুক বসানো আছে। অনেকগুলো বড় বড় তালা খুলে সিন্দুকের ডালাটা ও খুলে ফেলল।

আমি দেখলাম, একশো টাকার নোট—থাকে থাকে সাজানো আছে। ঘণ্টু আমাকে ঠাট্টার গলায় বলল, এখানে কত টাকা আছে ধারণা করতে পারিস ?

বললাম, না।

ও বলল, দশ লক্ষ। এ টাকা ইনকাম ট্যাক্সের হিসেবের বাইরে। জাস্ট খরচ করার জন্যে। এই অবধি বলে ঘণ্টু আমার দিকে অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল।

তখন ওকে দেখে আমার মনে হল যে, ও ভেবেছিল, ওর ওই থাকে থাকে সাজানো অপ্রয়োজনীয়

BanglaBook.org

কাগজগুলো দেখে আমি ওর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে বলব, আমার অন্যায় হয়ে গেছে ঘণ্টু, আমাকে ক্ষমা করে দে।

তেমন কিছু করলাম না দেখে ঘণ্টু খুব অবাক হয়ে গেল মনে হল।

তারপর আবার ডালা বন্ধ করে ওর বাবার অয়েলপেন্টিংটা দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখল।

ওর বাবাকে আমি জীবদ্দশায় দেখিনি। ভাল করে ওর বাবার ছবির দিকে চাইলাম। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি—কোঁচানো ধুতি—পাকানো গোঁফ—হাতে হাতির দাঁতের লাঠি—মুখে একটা ক্রুর খুনি-খুনি ভাব। ঘণ্টুর বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হল, আমি কোনও প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের ছবি দেখছি—ডাইনোসোর বা ওরকম কিছু।

সেই মুহূর্তে আমার ঘণ্টুর উপর খুব মায়া হল, আর রাগ হল ঘণ্টুর বাবার উপর। যে বাবা নিজের ছেলেকে জীবনে শুধু দোকান আগলাতে আর দোকান সামলাতেই শিখিয়েছিল, পৃথিবীতে মানুষ যে আরও অনেক কিছুর জন্যে জন্মায়, তার যে টাকা রোজগার বা জমানো ছাড়াও আরও অনেক কিছু জীবনে করবার থাকে তা শিখিয়ে যায়নি—তার ছেলে তার মতোই হয়েছে। বাবার মতো হওয়ার জন্যে ঘণ্টুর বাবার নিজের যত দোষ, তার বোধ হয় ততটা নয়।

ঘণ্টু তারপর আমাকে বলল, এবার তুই যেতে পারিস।

আমি বললাম, বললি কনসালটেশান ছিল—তোর মামা কোথায়?

ঘণ্টু বলল, আমার কোনও মামা নেই। মনে কর, আমার সঙ্গেই কনসালটেশান করলি। এই নে তোর ফি—রাখ; বলে ঘণ্টু পাঁচটা একশো টাকার নোট আমাকে এগিয়ে দিল।

আমি শক্ত গলায় বললাম, কনসালটেশানে আমি কারও বাড়ি আসি না, সকলে আমার ওখানেই যায়। তোর বাড়িতে ফি-এর জন্যে আসিনি। ফি দিচ্ছিস কেন?

ঘণ্টু ইনসিস্ট করল, বলল, তোর কাছ থেকে কোনওরকম দয়া চাই না আমি।

তখন আমি বললাম, বেশ তো, টাকাটা দে। বলেই নিয়ে নিলাম।

এই অবধি বলে মিত্তির সাহেব চুপ করে গেলেন।

সব শুনে জয় একবার মিত্তির সাহেবের দিকে তাকাল। কোনও কথা বলল না।

ওরা আবার হোটেলের দিকে ফিরতে লাগল।

জয় বলল, তারপর কী হল?

—কী হবে? ভেবেছিলাম লজ্জায় ঘণ্টু হয়তো সে কর্মচারী ভদ্রলোককে মেয়ের বিয়ের ধার শোধের জন্যে কিছু টাকা দেবে। তা না, ভদ্রলোক তার পরদিন কাঁদতে কাঁদতে এলেন আমার বাড়িতে। বললেন, ঘণ্টু নাকি তাঁকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। সব শোনার পর ঘণ্টুর দেওয়া পাঁচশো টাকা ওঁকে দিয়ে দিয়েছিলাম এবং যতদিন না চাকরি জোগাড় করে দিতে পেরেছিলাম একটা, ততদিন ওঁকে যখন যা দরকার সাহায্য করেছিলাম—ওঁকে মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করার খেসারত স্বরূপ।

জয় বলল, এত কাণ্ডর পরও আপনাদের বন্ধুত্ব এখনও টিকে আছে?

মিত্তির সাহেব হাসলেন, বললেন, তোমাকে তো বলেছি, এ বন্ধুত্ব নয়। ঘণ্টু একটা ইন্টারেস্টিং কেস। ওকে যত দেখি, ততই অবাক হই। ওকে কাছ থেকে, দূর থেকে, বাইনোকুলারের সামনে দিয়ে এবং পেছন দিয়ে নানাভাবে আমার দেখতে ইচ্ছা হয়—কোন বিশ্বাসে ভর করে ও বড় হয়েছে, যেন-তেনভাবে টাকা রোজগার করছে—কোন বিশ্বাস নিয়ে ও বেঁচে আছে—ও জীবনে যা চেয়েছিল তা কি ও পেয়েছে? —খুব জানতে ইচ্ছা করে। ও কি সত্যিই বিশ্বাস করে, টাকা কামানো ও টাকা জমানোর মধ্যেই সব শান্তি? তাই যদি বিশ্বাস করে, তা হলে হঠাৎ এই হোটেলের বেয়ারাদের জন্যে ও লড়াই করতে চায় কেন? সে কি শুধুই ভডকা খাওয়ার আফটার-এফেক্ট? জানি না, জীবনে কোন বিশ্বাসে ভর করে ও বেঁচে আছে।

BanglaBook.org

জয় হোটেলের ব্রেকফাস্টের পর একা একা হাঁটতে বেরিয়েছিল। রোদটা বেশ কড়া হয়েছে। বেলা দশটার পর সমস্ত জায়গাটা তেতে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতে জয় কবরখানার দিকে চলে এল। কবরখানার পিছনে একটা উঁচু টিলা উঠে গেছে। পরশুদিন বিকেলে এ পথে যাবার সময় একটা পাটকিলে-রঙা খরগোশকে টিলার নীচে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছিল। টিলার নীচে এবং পাশে মুত্তেলামা ও টোটম্মার ছোট দুটি মন্দির। ভোরের বেলা কারা যেন পুজো চড়িয়ে গেছে।

টিলার মাথায় উঠে আসতেই চোখ জুড়িয়ে গেল।

এক পাশে দূরে দেখা যাচ্ছে অন্য টিলার উপরে এখানের সাদা বড় গির্জাটা—সকালের উপাসনা হয়ে গেছে। ভোরবেলা ঘণ্টা বাজতে শুনেছে গির্জায়। এখন এই নিস্তব্ধ সকালের উজ্জ্বল আলোয় ছেয়ে আছে দূরের গির্জা। গির্জার টিলা আর যে টিলায় ও দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে একটা উপত্যকা। সবুজ। মধ্যে টিলাটা থাকার জন্যে সমুদ্রের বালি উড়ে এসে পড়তে পারে না।

অন্যদিকে চাইলে চোখে পড়ে ব্যাকওয়াটারের সুন্দর সাদা চাদর—তার পিছনে ঝাউবন আর বালিয়াড়ি, ফাঁকে ফাঁকে নুলিয়াদের বস্তি। ব্যাকওয়াটারের এপারে ধাঙ্গড় পাড়া—দুটো-একটা শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যাকওয়াটারের জলের পাশে পাশে। ব্যাকওয়াটারের জল গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে।

দূরে, সামনে আদিগন্ত সমুদ্র—ঘর-বাড়ি-বাংলো সব ছাড়িয়ে। সমুদ্রের বুকে কালো কালো বিন্দুর মতো ক্যাটামেরনগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে। এখনও নুলিয়াদের ফেরার সময় হয়নি। হাওয়া আসছে হু হু করে তালপাতা উড়িয়ে, ঝাউবন নাড়িয়ে, সমুদ্রের দিক থেকে।

টিলাটার নীচেই পাউন্ড সাহেবদের বাংলো—ক্যাপসিকাম রোডে। দেখা যাচ্ছে, ফাদারেরা ঘোরাফেরা করছেন।

পাউন্ড সাহেবের সঙ্গে কালো বিকিনি পরা একটি অতোধিক কালো ছিপছিপে তেলতেলে তেলেগু মেয়ে রোজ সাঁতার কাটে। রোজ একসঙ্গে সমুদ্র থেকে উঠে বাংলো অবধি হেঁটে আসে। ফাদারের সঙ্গে মেয়েটার কী সম্পর্ক কে জানে?

জয়ের গায়ে সাঁ সাঁ করে সমুদ্রের হাওয়া লাগছিল—টেনিস খেলার মোটা গেঞ্জিটা হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছিল। মুত্তেলামা আর টোটম্মার মন্দিরের মধ্যে হাওয়াটা ধাক্কা খেয়ে দমকে দমকে উপরে উঠে আসছিল। একটা ফিসফিস হিসহিস শব্দ হচ্ছিল ছোট মন্দির দু'টির মধ্যে।

জয় আস্তে আস্তে মন্দির দু'টির কাছে নেমে গেল। হাওয়ায় যে শিস উঠছে সে শব্দ জয় কান পেতে শুনল।

তারপর জয় মন্দিরের কাছে গিয়ে মুখ নিচু করে ফিসফিস করে ভয়ে ভয়ে শুধোল—বিশ্বাস, বাড়ি আছ নাকি? বিশ্বাস, বাড়ি আছো?

কেউ জবাব দিল না।

হাওয়াটা একবার হাঃ হাঃ করে উঠল; হাওয়াটা হাঃ হাঃ করে উঠল ওর প্রশ্নের নির্বুদ্ধিতায়—কারণ মন্দির যখন আছে, তখন বিশ্বাস তো আছেই—এর মধ্যে জিজ্ঞাসার কী আছে।

পরক্ষণেই হাওয়াটা ফিসফিস করে নরম গলায় অপরাধীর মতো কী যেন টেনে টেনে বলতে লাগল। জয়ের মনে হল যেন হাওয়াটা বলছে—নেই—নেই, নেই—নেই।

মুত্তেলামা আর টোটম্মার মন্দিরের কাছেই ও দাঁড়িয়ে ছিল; এমন সময় একটি মেয়েলি গলায় ডাক শুনতে পেল, টিলার নীচের রাস্তা থেকে। কে যেন চেঁচিয়ে ডাকছে কাকে। কান খাড়া করতেই শুনতে পেল, একটি মেয়ে চেঁচিয়ে বলছে—ফাদার, ফাদার, লেটস গো নাউ। উই আর লেট।

জয় চোখ তুলে দেখল, সেই কালো মেয়েটি পাউন্ড সাহেবের বাংলোর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা সাদা তোয়ালে, পরনে সেই কালো বিকিনি।

ফাদার পাউন্ড তাঁর ঘি-রঙা শর্টস আর রবারের চটি পরে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন। খালি

BanglaBook.org

গায়ে।

মেয়েটির সঙ্গে রাস্তা ধরে সমুদ্রের দিকে এগোবার সময় জয়কে দেখতে পেলেন ফাদার। উপরের দিকে চেয়ে ডাকলেন, হে চ্যাটার্জি, কাম ডাউন, লেটস গো ফর আ সুইম টুগেদার।

জয় টিলা থেকে নামতে না নামতে মেয়েটি পাশের একটি বাংলোয় ঢুকে গেল। মনে হল, ও অন্য কাউকে ডেকে আনবে, কিংবা বাংলোয় কোনও দরকার ওর।

জয় রাস্তায় নেমে আসতেই ফাদার পাউন্ড বললেন, চলো, আমরা এগোই। উপমন্যা আসবে পরে।

ওরা দু'জনে কাজুবাদাম আর ঝাউয়ের ছায়া-ঢাকা পথে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল সমুদ্রের দিকে।

একটু পরে ফাদার জয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে সেদিন কী বলবে বলেছিলে যেন? এখন বলতে পারো।

জয় একটু ইতস্তত করল, বলল, তেমন কিছু নয়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি অত দূর দেশ থেকে এখানে এসেছ কেন? কী খুঁজছ তুমি এখানে?

পাউন্ড সাহেব যেন একটু চমকে উঠলেন। প্রথমে হয়তো ভাবলেন, ইঙ্গিতটা তার সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করে, অথবা ভাবলেন, জয় গোয়েন্দা দপ্তরের লোক; তার পরই হয়তো বুঝতে পারলেন জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে যে, হয়তো অন্য কিছু শুধোচ্ছে।

সাহেব একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বললেন, ব্যাপারটা সিম্পল। আমি ভগবানের খোঁজে এসেছি।

বলেই তাঁর বৃষস্কন্ধ থেকে ঝোলানো বুকের উপর দোল-খাওয়া ক্রুশটাকে মুঠো করে ধরলেন। যেন ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যেই।

জয় একটু চুপ করে থেকে বলল, ভগবান কি আছে?

ফাদার একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন জয়ের দিকে, বললেন, ভগবান নেই? তুমি বলো কী?

জয় বলল, আমার তো মনে হয়, নেই। আমি বিশ্বাস করি না ভগবান আছে বলে।

ফাদার দাঁড়িয়ে পড়ে জয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিস্ফারিত চোখে বললেন, তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?

জয় হাসতে হাসতে বলল, অ্যাবসোলুটলি।

ফাদার চটলেন না, ঝগড়াও করলেন না। ভগবানের অস্তিত্বের স্বপক্ষে বক্তৃতাও দিলেন না। ফাদার পাউন্ড শান্তভাবে বললেন, তুমি হয়তো ভুল করছ।

তারপর একটু কী ভেবে নিয়ে আবার বললেন, যাই হোক, তা হলে অন্যভাবে বলি, যদি তোমার মতে ভগবান না-ই থেকে থাকেন, তা হলে মনে করো আমি বিশ্বাসের খোঁজে এসেছি। এত দূর—এই দূর দেশে।

—কীসে বিশ্বাস? ভগবানই যদি না থাকল তো তার উপর বিশ্বাস কীসের?

ফাদার পাউণ্ড বললেন, মনে করো আমি বিশ্বাসে বিশ্বাস খুঁজতে এসেছি।

জয় অবাক চোখে তাকাল।

ফাদার তাঁর পেশল হাত দুটি দু' দিকে ছুঁড়ে বললেন, ওয়েল, আই ডোন্ট নো। অ্যান্ড প্রবাবলি য়্যু ডোন্ট নো আইদার।

এমন সময় সেই তেলতেলে তেলেগু মেয়েটি দৌড়তে দৌড়তে এসে ওদের ধরে ফেলল। দৌড়ে আসার দরুন ওর সুন্দর সুঠাম বুক দুটি ওঠানামা করছিল। ওর চোখের নীচে একটু ঘাম জমেছিল। ফাদার অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

জয় ভাল করে দেখল মেয়েটিকে। দারুণ দেখতে উপমন্যাকে।

ফাদার বললেন, আলাপ করিয়ে দিই—এই যে চ্যাটার্জি আর এর নাম উপমন্যা। ভাবনা-চিন্তায় উপমন্যা একেবারে ওরিজিনাল—এজন্যে ওকে আমার দারুণ লাগে। ও এখানেই থাকে—ওর বাবার একটা ছোট ফিশ ক্যানিং ইন্ডাস্ট্রি আছে এখানে। সার্ডিন, স্যামন, লবস্টার ইত্যাদি ক্যান করে ও।

BanglaBook.org

ওর বাবাকে সাহায্য করে। বাবা এখন বুড়ো হয়ে গেছেন।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা সমুদ্রে পৌঁছে গেল।

ফাদার পাউন্ডকে দেখেই অরফ্যানেজের বাচ্চা মেয়েগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফাদার পাউন্ড দারুণ প্রিয় এদের কাছে। ফাদার পাউন্ড ওদের সঙ্গে হই-হই করে জলে নেমে পড়লেন। রোদের মধ্যে ছিটকে-ওঠা জলকণাগুলো হিরের টুকরোর মতো ঝিকমিক করে উঠল।

জয় গেঞ্জিটা খুলে ফেলল। শর্টস পরাই ছিল। সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফাদার পাউন্ড সাঁতার কাটতে কাটতে জয়কে ওঁর কাছে আসবার জন্যে চেঁচিয়ে ডাকলেন।

উপমন্যুও সাঁতার কাটতে কাটতে ওদের কাছে চলে এল।

নোনাজলের গন্ধে, ঢেউয়ের নাগরদোলায়, এক আকাশ রোদ্দুরে ওরা সকলে ভেসে বেড়াতে লাগল। কানের কাছে ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের ফেনাগুলো বুজবুজ বুজবুজ করে দুর্বোধ্য ভাষায় যেন কী বলাবলি করতে লাগল।

এক সময় ফাদার পাউন্ড জয়ের পাশে এসে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, বুঝলে, বুঝলে চ্যাটার্জি—আমরা হয়তো দুজনেই ভুল।

কপাল থেকে ডান হাত দিয়ে চুল সরিয়ে জয় বলল, হাউ ডু য়্যু মীন ?

ফাদার পাউন্ড নোনাজল কুলকুচি করে ফেলে বললেন, জানো, আমি তুমি উপমন্যু—আমরা সকলেই বিশ্বাসী। আমরা সকলেই কিছু না কিছুতে বিশ্বাস করি। আমি ভগবানে করি, তুমি হয়তো অন্য কিছুতে করো, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিই। উই বিলিভ ইন সামথিং অর দ্যা আদার। বাট ডু য়্যু নো দ্যা ট্রুথ ? দ্যা অ্যাবসোলুট ট্রুথ ?

জয় একটা ঢেউ সামলে নিয়ে ফাদারের কাছে এল। বলল, কী ? হোয়াটস দ্যা বিগ ট্রুথ ?

পাউন্ড সাহেব বললেন, উই কান্ট ক্যারি ইট অ্যালোন। তোমার বিশ্বাস, সে যে বিশ্বাসই হোক না কেন, তুমি একা একা বইতে পারো না। বলেই সাঁতার কাটতে কাটতে দূরে চলে গেলেন ফাদার পাউন্ড।

জয় তাঁর কাছে সাঁতরে গিয়ে বলল, তার মানে ?

ফাদার জলের উপর ডান হাতটা তুলে বললেন, য়্যু নো চ্যাটার্জি, ইটস লাইক আ রিলে রেস।

তারপর আবার জোর দিয়ে বললেন, বুঝেছ, লাইক আ রিলে রেস। দেয়ার মাস্ট বী সামওয়ান ওয়েটিং ফর য়্যু অ্যাট দ্যা আদার এন্ড, টু টেক ইওর হ্যান্ড কি ফ্রম ইয়োর হ্যান্ড।

কেউ কেউ ভাগ্যবান। তাদের জন্যে বা কেউ দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের বিশ্বাসের রুমাল হাতে তুলে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি আবার এক জীবন বা এক যুগ দৌড়ে যায়। আবার কেউ বা ভাগ্যবান নয়। তাদের জন্যে কেউই দাঁড়িয়ে থাকে না। প্রথম ল্যাপ দৌড়ে গিয়েই তারা মুখ থুবড়ে তাদের বিশ্বাসের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ইট অল ডিপেন্ডস—কারা কার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। বাট দ্যা ফ্যাক্ট রিমেইনস দ্যাট য়্যু জাস্ট কান্ট ক্যারি ইট। য়্যু সিম্পলি ক্যান্ট ডু ইট অ্যালোন।

জয়ের মনে হল, চতুর্দিকের ঢেউ-ভাঙা ফেনারা বুজবুজ করে বলতে লাগল—য়্যু জাস্ট কান্ট ডু ইট অ্যালোন।

উপমন্যু কাছেই ছিল। ও ফাদারের শেষ কথাটা শুনেছিল। উপমন্যু হেসে উঠল।

জয় জল কেটে ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, হাসছিলেন কেন ? কী হল ?

উপমন্যুর জলে-ভেজা কালো চোখ দুটিকে দুটি গলে-যাওয়া চকচকে কাজললতার মতো দেখাচ্ছিল। উপমন্যু হাসতে হাসতে বলল, ফাদারের মুখ থেকে না শোনা অবধি কি বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার যে, য়্যু ক্যান্ট ডু ইট অ্যালোন ?

জয় হেসে উঠল। বলল, আমরা খুব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম—দুষ্টুমি নয়।

উপমন্যু আবার হেসে উঠল। বলল, রিয়্যালি, পৃথিবীর পুরুষগুলো শুধু মূর্খই না, তারা কানাও। চোখওয়ালা বুদ্ধিমান পুরুষগুলো সব মরে গেছে। কবে যেন এক এক করে তারা সকলেই মরে গেছে।

BanglaBook.org

উপমন্যুর চোখ দুটির মধ্যে কী যেন আছে। অক্টোপাসের মতো। কাছে যেতে ভয় লাগে। মনে হয় একবার জড়িয়ে গেলে ছাড়ানো অসম্ভব। উপমন্যু দারুণ মেয়ে। অথচ ব্রহ্মচারী ফাদার পাউন্ড কেন যে এ মেয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করছেন কে জানে? জয়ের মনে হয়, পুরা-যুগের ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করাও এ মেয়ের পক্ষে অসাধ্য নয়। ওকে বেশি প্রশ্রয় দিলে ফাদার পাউন্ডকে তাঁর গলার ক্রুশ সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে। ধর্মপ্রচারের বদলে এখানে সারা জীবন বসে বসে ক্যানে চিংড়ি মাছ আর স্যামন সার্ডিন ভরতে হবে।

জয়দের কাছেই এক দম্পতি চান করছিলেন। বোধ হয় বাঙালি। দুজনেরই প্রচণ্ড মেদবহুল শরীর। দুজনেরই দু'পাশে দুটি করে নুলিয়া। ভদ্রমহিলাকে ধরে নুলিয়া দুটি কাছিমের মতো একবার ওঠাচ্ছে আর একবার নামাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভদ্রমহিলা নাকি-নাকি সুরে চিৎকার করছেন—উঁ আঁঃ, মরে যাঁব, ইত্যাদি। ভদ্রলোক সাহস দেখিয়ে ঢাউস শুশুকের মতো উল্টে গিয়ে জল-ভরা নাকে স্ত্রীকে বলছেন, ভঁয় নেই, ভঁয় নেই।

উপমন্যু জয়ের কাছে ভেসে এসে বলল, আপনার দেশোয়ালি। ভাল করে চেয়ে দেখুন, ওদের দুজনের কারুরই শরীরে কোমর বলে কিছু নেই। জানেন মিঃ চ্যাটার্জি, আমি মানুষদের দু ভাগে ভাগ করেছি। যাদের কোমর আছে এবং যাদের নেই। যাদের কোমর সরু নয়, দে মিস অল দ্যা ফান ইন লাইফ। কোনও সুখই তাদের সুখ নয়। আর দেখুন, আমি মাছের মতো—আমি মাছের মতো সমুদ্রে পাক খাই, জীবনে পাক খাই—নিজেকে ওলটাই, পালটাই, ডুবসাঁতার দিই, চিতসাঁতার দিই, রোদ-পড়া জলের তলে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াই।

আশ্চর্য! আপনার এই দুজন দেশোয়ালি কোমর কমিয়ে ফেলেন না কেন? জীবনে এরকমভাবে বেঁচে কী লাভ? আমার তো মনে হয়, বেঁচে যদি থাকতেই হয়, তা হলে মাছের মতোই বাঁচা উচিত। তাই না?

ফাদার পাউন্ড সাঁতার কাটতে কাটতে এদিকে চলে এলেন।

ওঁর পিঠে অরফ্যানেজের একটি সাত-আট বছরের মেয়ে ঝুলে আছে। ফাদার বললেন, দ্যাখো উপমন্যু, আমি ওকে পিঠে নিয়ে ডুব দিচ্ছি।

ফাদারের পিঠে-ঝোলা বাচ্চাটা আনন্দে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল।

ফাদার পাউন্ড একটা ছোট তিমি মাছের মতো মেয়েটিকে পিঠে করে হুসস করে ডুবে গেলেন।

উপমন্যু বলল, মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি চোখ খুলে ডুব দেন? না চোখ বন্ধ করে?

জয় বলল, চোখ বন্ধ করে।

উপমন্যু জিভ আর তালু দিয়ে দু-দুবার টাক টাক শব্দ করে বলল, মাছেরা কি চোখ বন্ধ করে জলে চলে? না চোখ খুলে?

জয় বলল, চোখ খুলেই।

—তবে? বলে উপমন্যু দারুণ দুষ্টুমিভরা চোখে হাসল। বলল, সব সময় চোখ খোলা রাখবেন।

পরক্ষণেই আবার বলল, আমরা একসঙ্গে চোখ খুলে ডুব দিই, দেখবেন কী মজা। বলেই, জয়কে আপত্তি করার সুযোগ না দিয়েই জয়ের হাত ধরে জলের নীচে ডুব লাগাল।

প্রথমে অভ্যাসবশে জয় চোখ বন্ধ করেই ছিল। জলের নীচে উপমন্যু ওর গায়ে ওর আঙুল ছোঁয়াল—জয় চোখ খুলল।

জয় ভাবতে পারেনি, সত্যিই ভাবেনি যে, চোখ খুলে আকাশভরা রোদের নীচের সমুদ্রে ডুব দিলে এমন ছবি দেখা যায়।

চারদিক কী দারুণ দেখাচ্ছে। কাছেই জলে ডুবে-থাকা একটা সবজে-কালো টিলা। নরম উজ্জ্বল সবুজ জলের রং। জলের নীচে দূরে দূরে সাঁতারুদের ফ্যাকাশে গোলাপি আর কালো শরীরগুলোর কিছু কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের নীচে পায়ের তলায় স্তিমিত চিকচিকে বালি। এই সুন্দর সবুজাভায় উপমন্যুর শরীরের ফিঙ্গে পাখির মতো কালো রঙে কেমন একটা জলজ উদ্ভিদের হালকা সবুজ উজ্জ্বলতা লেগেছে। উপমন্যু সত্যিই মাছের মতো পাক দিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটছে—নিজের শরীরটাকে নিয়ে এই অদ্ভুত সুন্দর জলজ পরিবেশে ওর নিজের দুরন্ত ইচ্ছাগুলো নিয়ে বুদবুদের মতো

BanglaBook.org

ও যা-খুশি-তাই করছে।

হঠাৎ পাক খেতে খেতে ওর খোঁপা খুলে গেল। ও দু'হাতে খোঁপা ঠিক করতে করতে দুটি মসৃণ চকচকে উরুতে জল কেটে কেটে খানিকটা উপরে উঠে এল।

ওর সঙ্গে সঙ্গে জয়ও উঠে এল।

ওরা দুজনেই হাঁপাচ্ছিল।

উপমন্যা হাসছিল। দম নিয়ে বলল, কেমন ? বলেছিলাম না ?

জয় বলল, আপনি ডুব দিলে কিন্তু খুব সাবধানে দেবেন।

উপমন্যা বলল, ডুব দিলে কখনও সাবধানে দিতে নেই। অবহেলায়, খুশিমতো ডুব দিতে হয়।

জয় হাসল। উপমন্যাও হাসছিল। উপমন্যা বলল, আপনি এ কথা বলছেন কেন ?

জয় বলল, আপনি মাথায় সাঁতারের টুপি পরেন না কেন ? জলের নীচে যে টিলাটি ছিল তাতে অনেক খাঁজ-কাটা-কাটা পাথর আছে—কোনওরকমে আপনার খোলা চুল ওতে আটকে গেলে আর উপরে উঠে আসতে পারবেন না। একেবারে সলিল-সমাধি হবে।

উপমন্যা তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, আমি ওদিকে যাই-ই না। একদিন শুধু ফাদারের সঙ্গে গেছিলাম। ফাদারের দারুণ দম। অনেকক্ষণ ডুবে থাকতে পারেন ফাদার।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, জানেন, ওই টিলাটার উপরটা সমান। ওইখানে শুয়ে থাকার মতো জায়গা আছে। দু-এক মিনিট শুয়েও ছিলাম সেদিন। দারুণ লাগে—পিছল পিছল গালচের মতো—কী নরম—আর বেশ গরম। দারুণ আরাম লাগে শুয়ে থাকতে। কী জানেন, পৃথিবীর উপরে আপনি যেখানেই থাকুন, আপনার জামা পরতে হয়, দরজা বন্ধ করতে হয়, পর্দা টাঙাতে হয় ; উপরে আপনাকে কেউ না কেউ ডিস্টার্ব করার থাকেই —অথচ এখানে কেউ নেই—শুধু দু'একটা বোবা মাছ, একটা দুটো উজ্জ্বল বুদবুদ, ঢেউ-ভাঙার কাঁপা কাঁপা চাপা শব্দ—তাছাড়া আপনার প্রাইভেসি ডিস্টার্ব করার কেউ নেই—কোনও মানুষের নোংরা চোখ নেই এখানে। কী দারুণ শান্তি বলুন তো ? আমার ভাবলেই ভাল লাগে।

আর কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর জয় বলল, আপনারা কি এখন উঠবেন ?

অবাক গলায় উপমন্যা বলল, এত তাড়াতাড়ি ?

জয় বলল, তাহলে আমি উঠি, কেমন ?

জয় ফাদার পাউন্ডকে চেঁচিয়ে বলল, আমি উঠছি।

ফাদার হাত নেড়ে বললেন, ও কে, চ্যাটার্জি, সী য়্যু এগেইন।

জয় উপমন্যাকে বলে একটা বড় ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে পাড়ে এল। তারপর বালিতে ফেলে-রাখা গেঞ্জিটা কাঁধে ফেলে, ভেজা বালির উপর পা ফেলে ফেলে সমুদ্রের পার ধরে মিসেস স্টেইনের গেস্ট হাউসের দিকে হেঁটে চলল।

আজ লাল ভেটকি ধরা পড়েছে খুব। ক্যাটামেরনগুলোর কুচকুচে কালো খোলে লাল ভেটকির গাদা দারুণ দেখাচ্ছে। ছোট বড় ঝুড়ি নিয়ে মাছের দালাল, মহাজন, খুচরো খরিদ্দার এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সমুদ্রের এদিকটা বেশ নির্জন। একদল বিদেশি স্ত্রী-পুরুষ, বাচ্চাকাচ্চা সকলে মিলে একসঙ্গে জলে নেমেছে। বাচ্চাগুলো হাঁটুজলে রাবারের বল নিয়ে লাফালাফি করছে। কয়েকজন ছেলেমেয়ে ইনফ্লেটেড ম্যাট্রেস নিয়ে ভেসে রয়েছে। কেউ কেউ স্থানীয় নুলিয়াদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া মোটরগাড়ির টিউব নিয়ে ভেসে আছে।

ওদের পেরিয়ে এসে আবার নির্জনতা।

মিসেস স্টেইনের গেস্ট হাউসের সামনে বালিতে পর পর কয়েকটা পাতায় ছাওয়া ঘর আছে। তার মধ্যে একটা জয়ের। নুলিয়ারা দশ টাকা নিয়ে বানিয়ে দিয়েছে। ওর নীচে শুয়ে বসে তেল মাখা, সাঁতার কেটে এসে বিশ্রাম নেওয়া, জামা-কাপড় ছাড়া, সব।

জয় দেখল, ওর ঘরটায় চন্দ্রাইয়া বসে আছে। তার পাশে কামাইয়া ও তার সমবয়েসী কতকগুলো নুলিয়া ছেলে গরম বালির মধ্যে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে—আর তেলেগুতে কী গান

BanglaBook.org

গাইছে। কথা না বোঝা গেলেও ছন্দটা দারুণ লাগছে। কেটে কেটে খেমটার মতো করে হাত-পা সমুদ্রের মতো দুলিয়ে ওরা গাইছে আর নাচছে।

জয়কে দেখে ওরা লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। তারপর হাসতে লাগল।

জয় কাছে এসে হিন্দিতে বলল, কী হল ? নাচ থামালে কেন ? কীসের নাচ এই ভর-রোদ্দুরে ?

চন্দ্রাইয়া বলল, সব ছোঁড়াগুলো দিনে-দুপুরে নেশা করেছে। যাত্রার দিন যত এগিয়ে আসছে ততই ওদের হুজ্জতি বাড়ছে।

জয় পাতার ঘরে এসে বসল।

চন্দ্রাইয়ার ছোটকঁলুর কড়া গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছিল।

চন্দ্রাইয়া বলল, কী বাবু ? তেল মাখবে না ?

জয় বলল, না, আজ নয়।

মিসেস জেমস ভেজা বালিতে সুইমিং কস্ট্যুম পরে উপুড় হয়ে শুয়ে সান-গ্লাস পরে পেরী ম্যাসনের বই পড়ছিল। হঠাৎ জয়কে লক্ষ করে মুখ তুলে বলল, মিঃ চ্যাটার্জি, জুডিথকে দেখেছ ?

—কই, না তো ? কেন ? জুডিথ আজ চান করতে আসেনি ?

—এসেছিল, কিন্তু নুলিয়ারা বলছে, আসার আগে ফিরে গেছে হোটেলে। তুমি যদি এখনই ফেরো তা হলে একটু দেখবে তো। আমার ঘরে আছে কিনা ? থাকলে পাঠিয়ে দিয়ো, প্লীজ ! আর ও যদি না আসতে চায় তো বোলো যেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমার সঙ্গে কথা বলে। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

জয় একটু বসে থেকে উঠে পড়ল। তারপর বালি ভেঙে হোটেলের দিকে উঠতে লাগল।

হিতেন মিত্তিররা কেউ নেই। আজকে ওঁরা গেছেন স্টেশানে, ফেরার রিজার্ভেশানের খোঁজ করতে।

জয় নিজের ঘরে না ঢুকে সোজা মিসেস জেমস-এর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ওর ঘরের সামনে পৌঁছে দেখল, দরজা বন্ধ এবং জানালার পর্দা টানা। ভেতরে ঘণ্টু ঘোষের গলা পেল জয়। জয় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘণ্টু ঘোষ বললেন, য়্যু আর এ সুইটি পাই।

জুডিথ ফিসফিসে চাপা গলায় বলল, য়্যু ওল্ড ফুল !

তারপরই একটা ঝাপটাঝাপটির আওয়াজ হল। কার্নিশে পায়রারা যেমন করে। অথবা হুলো আর মেনি বেড়াল। এমন সময় জুডিথ হি হি করে হেসে উঠল, তারপর হাসতে হাসতে বলল, কামড়াকামড়ি করার আগে দাঁতে জোর আছে কি নেই দেখে নিতে হয়। এই নাও, তোমার দাঁত।

ঘণ্টু ঘোষের এমবারাসড গলা শোনা গেল।

—আমার দাঁতগুলো বাঁধানো, খুলে পড়ে গেছিল।

জুডিথ ফুলে ফুলে হাসতে লাগল।

কী করবে ঠিক করতে না পেরে জয় নিজের ঘরে ফিরে এসে চান করতে ঢুকে গেল।

চান করতে করতে কিছুক্ষণ পর মিসেস জেমসের উত্তেজিত গলা এবং জুডিথের উচ্ছল হাসি শোনা যেতে লাগল। জয় বাথটাবে শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারল যে, নাটক জমেছে।

৭

এখন অনেক রাত্তির।

জুডিথ একটা গোলাপি-রঙা নাইলনের নাইটি পরে ঘুমিয়েছিল। পাশের খাটে মিসেস জেমস চিত হয়ে শুয়েছিল। তাঁর পেটটা একটা কুমড়োর মতো উঁচু হয়ে ছিল সবুজ নাইটির নীচে। মিসেস জেমস তার মুখের ও কপালের বলিরেখা ঢেকে রাখার জন্যে পুরু করে ক্রিম মেখে শুয়েছিল। চুলে কার্লিং-ক্লিপ লাগানো ছিল।

ঘরের আলো নিবোনো। বারান্দার আলোর একটা আভাস পর্দা ভেদ করে ঘরের মধ্যে হলুদ

BanglaBook.org

অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল।

জুডিথ ঘুমের মধ্যে একবার মাথা চুলকাল। তারপর ঘুমের মধ্যেই ওর ঠোঁটের কোণায় এক হাসির আভাস ফুটে উঠল।

ঘণ্টু ঘোষের কথা ভাবল জুডিথ, হি ইজ সাচ আ সিলি ফুল! এবং ভারী অসভ্য। বুড়োগুলো সব এমনিই। ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে বলল, ফ্যাটি ক্র্যাব।

ঘুমের মধ্যে মিসেস জেমসের কপালের রেখাগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গেল। তার বুকের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট হতে লাগল।

জুডিথ মিসেস জেমসের মেয়ে নয়। জুডিথ নিজেও আজ অবধি তা জানে না। মিসেস জেমস কলকাতার শেঠ আগরওয়ালার রক্ষিতা। আজ পনেরো বছর কলকাতার সেরা হোটেলে তাকে ঘরভাড়া করে রেখেছে মিঃ আগরওয়ালা।

কিন্তু সমস্ত কিছুই পুরানো হয়ে যায়, চা-বাগানের সমস্ত সুগন্ধি চা একদিন শেষ হয়ে যায়। আগরওয়ালা বুদ্ধিমান, সে যেমন এক জায়গার চা তুলতে থাকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য জায়গায় নতুন চা গাছ লাগাতেও থাকে। যাতে পাহাড়ের এ ঢালের চা শেষ হলে, ও ঢাল থেকে সে মুঠো মুঠো কচি সবুজ সুগন্ধি পাতা তুলতে পারে।

মিঃ আগরওয়ালা জানত যে, একদিন লিন্ডা জেমস বুড়ি হয়ে যাবেই। তাই তার হেপাজতে পাঁচ বছরের একটি মেয়েকে পাঁচ হাজার টাকায় কিনে রেখে দিয়েছিল। কড়ার ছিল, লিন্ডার বাগানের সব পাতা শেষ হয়ে গেলে অন্য বাগানের নতুন পাতাগুলিকে লিন্ডা মিঃ আগরওয়ালার হাতে তুলে দেবে। বদলে লিন্ডা জেমস সারাজীবন খাওয়া-পরা, গাড়ি, হোটেলের ঘরভাড়া পাবে। তাই তো লিন্ডা জুডিথকে এমন চোখের সামনে সমুদ্রে চান করিয়ে সান-ট্যান করিয়ে তার শরীরের অণু-পরমাণু সূর্যের উষ্ণ কণায় ভরে দেবার জন্যে এখানে এসেছে। জুডিথের এখন ষোলো বছর বয়স। এবারে কলকাতা ফিরেই জুডিথকে মিঃ আগরওয়ালার অপেক্ষমাণ হাতে তুলে দিয়ে লিন্ডা জেমসের ছুটি।

ছোটবেলা থেকে জুডিথ জানে লিন্ডা তার মা। ও জানে, তার বাবা লেবাননে মারা গেছে বহু বছর আগে।

জুডিথের উপর লিন্ডার সব ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যাতে সে মিঃ আগরওয়ালা এবং তার অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে পারে, সেইভাবে লিন্ডা জুডিথকে তিলে তিলে তৈরি করেছে। তাকে পড়াশোনা শিখিয়েছে, কিন্তু এমন বেশি পড়াশোনা শেখায়নি বা শেখাবে না যে, সে স্বাবলম্বী হয়। তাকে যাতে বেঁচে থাকতে হলে শরীরকেই নির্ভর করতে হয় এমনভাবে জুডিথকে তৈরি করেছে লিন্ডা জেমস।

ভালবাসা ?

কল-গার্লের জীবনে ভালবাসা কী ? ভালবাসা তো মূর্খ মেয়েরা বাসে। কলকাতার সবচেয়ে বড় হোটেলের ফ্ল্যাটে, নিত্যনতুন উপহার, বাঘা বাঘা মোটা মোটা লোকদের সঙ্গে ওঠা-বসা, এই জীবনের থ্রিলের কাছে হাউস-ওয়াইফের জীবন ? ভাবা যায় না।

লিন্ডা ভাবতে পেরেছিল, ভালবাসা একটা সর্বনাশা রোগ। প্রথম বয়সে এর রং যত গাঢ় থাকে, পরে তত নয়। প্রথম বয়সে এই আগুন বাঁচিয়ে চলতে পারলে আর ভয় নেই। লিন্ডা জেমস বিশ্বাস করেছে, বরাবর বিশ্বাস করেছে যে জীবনে ভালবাসা বলে কিছু নেই, শুধু শরীর আছে। মাঝে মাঝে মেয়েটার উপর নিজের মেয়ের মতোই মায়া যে হয়নি এমন নয়। তার নিজের মেয়ে হলে কি লিন্ডা জুডিথকে জেনেশুনে এমন করে তৈরি করতে পারত ? জানে না, লিন্ডা জানে না। সে শুধু জানে, সে শুধু বিশ্বাস করে যে, তার হাতে জুডিথ একটা দারুণ মেয়ে হয়ে উঠবে—অন্য কল-গার্লরা জুডিথকে হিংসা করবে—আর পরচুলা-পরা, চোখ-গর্তে-বসা সস্তা মেয়েগুলো ফিসফিস করে বলবে, লিন্ডা জেমস একটা মেয়েকে তৈরি করেছিল বটে।

ঘুমের মধ্যে লিন্ডা জেমস দু'বার কেশে উঠল। সমস্ত শরীরের ঢিলে হয়ে যাওয়া মাংসপেশীগুলো থলথল করে উঠল। লিন্ডা বুঝেছে, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জুডিথকে নিয়ে পালাতে হবে। মিঃ আগরওয়ালার জন্যে বহু বছর ধরে বেঁধে রাখা কচি শিকার পালিয়ে গেলে

BanglaBook.org

গতযৌবনা লিন্ডাকে শেঠজী পথে বের করে দেবে। তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যা আছে তাতে আমৃত্যু এমনভাবে বাঁচা চলবে না।

লিন্ডা জেমসের নিজের উপর বিশ্বাস আছে। সে বরাবর বিশ্বাস করে এসেছে যে, প্রস্টিটিউশান ইজ দ্যা ইজিয়েস্ট অ্যান্ড দ্যা মোস্ট কমফর্টেবল ওয়ে টু হেল। বিশ্বাস করে এসেছে যে জুডিথকে সে শরীরে মনে একেবারে তার যৌবনের উত্তরসূরি করে তুলবে। বিশ্বাস করেছে যে, জুডিথ তাকে শেষ পর্যন্ত লেট-ডাউন করবে না।

ঘণ্টু ঘোষকে ঘুমের মধ্যে একটু আগে একবার বোবায় ধরেছিল। ওঁকে প্রায়ই বোবায় ধরে। একটু আগেই হিতু মিত্তির উঠে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘণ্টু ঘোষ উঠে একবার বাথরুমে গেছিলেন, ডায়াবেটিসে ভুগছেন কিছুদিন হল। তারপর এক গ্লাস জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়েছিলেন।

এখন দু'জনে দু'খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। মাথার উপরে পাখাটা চাপা একঘেয়ে গুনগুনানি তুলে ঘুরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সমুদ্র থেকে বড় বড় ঢেউ ভাঙার ধপাস ধপাস শব্দ এসে খোলা জানালায় লাগছে।

ঘুমের মধ্যেও বেশ আজকাল জেগে থাকেন ঘণ্টু ঘোষ। ঘুমের মধ্যেও অভিশাপ দেন ইন্দিরা গান্ধীকে। ট্যাক্সের এমন রেট করেছেন যে, কারও পক্ষেই সব রোজগার দেখানো সম্ভব নয়। অবশ্য ঘণ্টু ঘোষ ভাল করে ভেবে দেখেছেন, যে কোনও আমলেই ট্যাক্স দেওয়া নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাননি।

দেখতে দেখতে সিন্দুকে এখন কুড়ি লক্ষ টাকা নগদ জমে গেছে।

ঘণ্টু ঘোষের এমনিতেই বিরাট ভুঁড়ি, তার উপর একেবারে আক্ষরিকভাবে দশমাস পোয়াতির অবস্থা। হাঁসফাঁস, হাঁসফাঁস। ঘুমিয়ে স্বস্তি নেই, জেগে স্বস্তি নেই ; কিছুতেই স্বস্তি নেই। কাঁচা দু'নম্বরী টাকার এমন যন্ত্রণা।

এখানে আসবার আগে তিনি জেনে এসেছেন যে, তাঁর নামে একটা বেনামী চিঠি পড়েছে ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনারের অফিসে। চিঠিটা যে কে দিতে পারে তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। যে-ই দিক সে যে তাঁরই কোনও ঘনিষ্ঠ কর্মচারী তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সে চিঠিতে নাকি তিনি কোথায় টাকা রেখেছেন, কেমনভাবে রেখেছেন, কত টাকা রেখেছেন, সব লেখা আছে। আসবার ক'দিন আগে তিনি বিশ্বস্তসূত্রে এ খবর পেয়েই যে কোনও সময়ে ইনকাম ট্যাক্স থেকে রেইড হতে পারে বলে, সঙ্গে সঙ্গে টাকা সরিয়ে ফেলেছেন।

তাঁর দোকানের তিরিশ বছরের পুরনো ও অতি বিশ্বস্ত দারোয়ান বিষণ সিং সোদপুরে একটি পোড়ো বাড়িতে থাকে। ঘণ্টু ঘোষের বাগানের পাশেই। সেই বাড়ির মেঝে খুঁড়ে অনেকগুলো অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন-বাক্সে সব টাকা ভর্তি করে করে সে সব ক'টি বাক্স একটি বড় কাঠের বাক্সে পুরে পুঁতে রেখে এসেছেন। বিষণ সিংকে বলে এসেছেন, ফিরে এসে তাকে এজন্যে পাঁচশো টাকা বকশিশ করবেন। কুড়ি লক্ষ দু'নম্বরী টাকা পাহারা দেবার জন্যে পাঁচশো টাকা বকশিশ করবেন।

নাঃ, ঘণ্টু ঘোষ ভুঁড়িতে হাত রেখে ভাবলেন, কাজটা ভুল হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারেই সস্তা করতে গিয়েই তিনি যত গণ্ডগোল পাকান। বিষণ সিংকে আরও একটু বেশি টাকার কথা বলে এলে হত। তাড়াতাড়িতে আর কোথাও টাকাটা বাড়ি থেকে সরানো গেল না।

মাঝে মাঝে ঘণ্টু ঘোষ আজকাল সিরিয়াসলি ভাবেন, টাকাটা নিয়ে কী করবেন, কী করা উচিত। গভর্নমেন্টের হাত বাঁচিয়ে এ টাকা কোনওরকমে জমেছে। গভর্নমেন্ট কী করেছে—আফটার অল দেশের জন্যে ? সেরকম গভর্নমেন্ট হলে টাকাটা নিশ্চয়ই ঘণ্টু ঘোষ দিয়ে দিত। যে টাকা ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স দিচ্ছে, তা তো সকলের চোখের সামনে নয়-ছয় করা হচ্ছে। ঘণ্টু ঘোষের স্বোপার্জিত টাকায় দেশের গুচ্ছের লোককে খাওয়াবে গভর্নমেন্ট, অত কাঁচা কাজ ঘণ্টু ঘোষ কোনওদিনও করবেন না।

আসলে ট্যাক্স না দিয়ে এত টাকা জমিয়ে ফেলার পিছনে অনেক রকম কৈফিয়ত নিজের মনে মনে জমিয়ে রেখেছেন ঘণ্টু ঘোষ।

টাকাটা নিয়ে কী করা যায় ?

BanglaBook.org

য়্যুনিভার্সিটিকে দান করে দেবেন ?

যাঃ কোনও মানে হয় না।

একমাত্র ভাগ্নে রাজীবকে দিয়ে যাবেন ? ছেলেটা একটা ওস্তাদ—তাঁর মতের বিরুদ্ধে জিতেন শা'র বাড়ির সেই কলেজে-পড়া কালো মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। যদিও ছেলেটা কিংবা মেয়েটা কেউই কিছু খারাপ নয়—যা দেখা যাচ্ছে এখন—কিন্তু তাঁর মতের বিরুদ্ধে গেছিল কেন রাজীব ?

নাঃ, কাউকেই দেবেন না।

উনি যে আরও কুড়ি পঁচিশ কি তিরিশ বছর বাঁচবেন না তা কে জানে ? আগেভাগে সব দিয়ে ফেলে তারপর শেষজীবনে আঙুল চোষার মধ্যে ঘণ্টু ঘোষ নেই। তাছাড়া টাকাটা না থাকলে আর জীবনে থাকল কী ? সকলে কানাঘুষায় জানে যে, ঘণ্টু ঘোষ দশ বিশ লাখ নগদ টাকারই মালিক—তাই না এত খাতির, প্রতিপত্তি ? যার বাড়িতে যান সে-ই স্কচ-হুইস্কি খাওয়ায়, পরিচিত মেয়ে-বউয়েরা পায়ে পড়ে প্রণাম করে। ঘণ্টু কাকু, ঘণ্টু জেঠু, ঘণ্টু মামু বলতে সবাই গদগদ হয়ে ওঠে। জানেন, জানেন—আরে ঘণ্টু ঘোষ সব জানেন ; সব বোঝেন।

যতদিন না সমাজ বদলাচ্ছে ততদিন টাকা নইলে কিছুই নয়। টাকার উপর চেপে বসে থাকো, সঙ্গে কিছু হার্ড ক্যাশ থাকুক, পৃথিবীর সব ব্যাটা খাতির করবে। টাকা হচ্ছে সব আনন্দ সব ক্ষমতা সব প্রাপ্তির মূল। প্রাণ থাকতে হাতে ধরে ঘণ্টু ঘোষ তাঁর পিতৃপুরুষ ও তাঁর নিজের সঞ্চিত টাকা আর কাউকে দিয়ে যেতে পারবেন না। ঘণ্টু ঘোষ বরাবর বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বাস করে এসেছেন—পৃথিবীতে যার টাকা আছে তার সব আছে।

হিতেন মিত্তির পাশ ফিরে শুলেন। মাঝে মাঝে হিতেন মিত্তির ঘুমের মধ্যে হেসে ওঠেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, তুমি কি এখনও ছ'মাসের শিশু ? ঘুমের মধ্যে দেয়ালা করো ?

হিতু মিত্তির হাসেন, কথা বলেন না।

বেঁটেখাটো মানুষটি—বেশ গোলগাল, কিন্তু স্মার্ট চেহারা—দুটি উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। হাসলে এখনও গালে টোল পড়ে। মাথার চুল সামনের দিকে উঠে গেছে ; কপালের দুপাশে পেকে গেছে। পাইপ খান, অথচ চালিয়াৎ নন।

হিতেন মিত্তির নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন। কলকাতার হাইকোর্টে তাঁকে এক ডাকে সকলে চেনে। অজাতশত্রু লোক। প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন, অন্যের জন্যেও প্রচুর খরচ করেছেন। নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ি, নিজের বাগানবাড়ি সব করেছেন। সম্মান, প্রতিপত্তি, জীবনে কোনও কিছুরই খেদ নেই। জীবনে যা চেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছেন। সুশ্রী, কল্যাণী স্ত্রী। একমাত্র মেয়ে—গত বছর তাঁর বিয়ে দিয়েছেন।

জীবনে কাউকে ফাঁকি দেননি হিতেন মিত্তির। না জজসাহেবদের, না মক্কেলদের, না নিজেকে। হিতেন মিত্তির কখনও ফাঁকিতে বিশ্বাস করেননি। তিনি বরাবর বিশ্বাস করেছেন, সবাইকে বলেছেন এবং নিজেও নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেন যে, ফাঁকি মেরে কোনও দিকেই বেশি দূর এগোনো যায় না। ফাঁকি দিলে শেষে ফাঁকেই পড়তে হয়।

আমরা ঠকা বলতে যা বোঝাই, জীবনে মিত্তির সাহেব সে রকম অনেকবার ঠকেছেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের কাছে ঠকেছেন। তাদের যা দিয়েছেন কিছুই তিনি ফেরত পাননি। ভালবেসে ভালবাসা, ভাল ব্যবহার করে ভাল ব্যবহার, টাকা দিয়ে টাকা—কিছুই তিনি ফেরত পাননি। তিনি জীবনে অনেক শঠতা, অনেক চক্রান্ত, অনেক নোংরামি দেখেছেন। মিত্রের মুখোশ পরা শত্রু, হিংসায় বুক-ফেটে-যাওয়া আত্মীয়, দ্বেষ ও ঈর্ষায় জর্জর বন্ধু—অনেক দেখেছেন।

আজকাল তিনি আর আশ্চর্য হন না। তিনি ভাবেন, নিজেকে নিয়ে নিজে সুখী হওয়াই সবচেয়ে ভাল।

পৃথিবীর কারও কাছ থেকেই কিছু চাইতে নেই, আশা করতে নেই, করলেই দুঃখ। অবশ্যম্ভাবী দুঃখ। যদি কাউকে কিছু দেওয়া যায়, তবে তার বদলে কিছু ফেরত পাবার আশা না করে দেওয়াই শ্রেয়। তার চেয়ে নিজেই নিজের মধ্যে সব সময় একটা প্রাপ্তির আনন্দ বোধ করা ভাল। হিতু

BanglaBook.org

মিত্তির বুঝেছেন যে, নিজের প্রাপ্তি নিজের কাছ থেকেই—অন্য কেউ, বাইরের কেউই কাউকে সত্যিকারের দামি কিছু দিতে পারে না। তাই লোকের কাছে ভালবাসা চেয়ে, কৃতজ্ঞতা চেয়ে মিছিমিছি নিজেকে ছোট করা কেন ? দুঃখ পাওয়া কেন ?

পাশের ঘরে জয় অঘোরে ঘুমিয়ে ছিল। প্রাচীন নব্য যুবক জয় চ্যাটার্জি এখন ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমের মধ্যে ও স্বপ্ন দেখছিল, সীমা এসেছে। এসে তার খাটে তার পাশে বসেছে। সীমা ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। ওর কানে ছোট্ট মুক্তোর দুল। সীমার কানের লতি, ওর উজ্জ্বল মসৃণ মুখ, ওর চিবুক, ওর কানের কাছে কুঁকড়ে থাকা কোমল অলক, সব মিলে সীমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

সীমা খাটে বসে পা দোলাচ্ছে বাচ্চা মেয়ের মতো। ওরা যেন কীসের গল্প করছে। ওরা যেন কোথায় বেড়াতে গেছে, শান্তিনিকেতন না কোথায় যেন, সঙ্গে জয়ের ও সীমার বাড়ির কারা কারা যেন আছে।

স্বপ্নে জয়ের সবে ঘুম ভেঙেছে। জয়ের হাতের পাতার উপর সীমার বাঁ হাতের পাতা রাখা আছে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে পাশ ফিরে শুয়ে জয় সীমার সঙ্গে গল্প করছে।

জয় জানে না, সীমা ওর কাছে এলে, কাছে থাকলে, ওর এত ভাল লাগে কেন ? সীমার মধ্যে জয়ের চোখে পৃথিবীর সব প্রেম, সব ঘাস, সব ফুল, সব ভোরের রোদ্দুর, সব বৃষ্টির রাত একাকার হয়ে আছে।

জয় আজ একা একা কেঁদেছে আর নিজেকে শুধিয়েছে—এমন করে ও সীমাকে ভালবাসল কেন ? যাকে ভালবাসা যায়, তাকে যদি নাই-ই পাওয়া যায়, তবে সে এমন করে ভালবেসে মরতে গেল কেন ?

জীবনে সে সুপ্রতিষ্ঠিত। নামী একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে সে একজন উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার। জার্মানিতে সে বহুদিন ছিল। অন্য অনেকের মতো আই-এস-সি ফেল করে কোনও কিছু করতে না পেরে নয়—এখান থেকে বি.এস সি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ব্যাচেলর ও মাস্টার ডিগ্রি করতে সে বিদেশে গেছিল।

সে যাই হোক, জয় কর্মজীবনে যা-ই হয়ে থাকুক, জয় আসলে একজন প্রেমিক। প্রেম ছাড়া জীবনে ও আর কিছুতে এমন গভীরভাবে বিশ্বাস করেনি।

ও বিশ্বাস করে যে, একজন পুরুষ ও একজন নারী পৃথিবীতে শুধু ভালবাসা দেওয়া ও নেওয়ার জন্যেই জন্মায়। আমরা জীবনে আর যা কিছু করি সবই অকিঞ্চিৎকর। আমাদের সব কর্ম, সব কীর্তি, সব টাকা, সব প্রাসাদ, সব প্রোমোশান, সব আবিষ্কার—সব বোগাস। আসলে যা থাকে, যা বরাবর ছিল, যা চিরকাল থাকবে, তা শুধু নীরব নরম ভালবাসা। না-বলা কথার বেদনা, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখের বোবা কান্না, জীবনে যা চাওয়া হল, কিন্তু পাওয়া হল না, তার সহনীয় অথচ সুগভীর দুঃখ।

তবে জয় এমনভাবে ওর অবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হবে এটা চায়নি। জয় কেবলই আকাশ-পাতাল ভাবছে। সীমার মুখ, সীমার হাসি, সীমার কথা টুকরো টুকরো হয়ে সীমার অতীত, সীমার স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি-জীবনের ছোট ছোট অনেক স্মৃতি ওর মনের আকাশে বার বার ভিড় করে এসেছে।

তবু আজ সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা দারুণ একটা চাপা কষ্ট পাবার পর জয় এখন স্বপ্নের মধ্যে সীমার নরম হাতে হাত রেখে শুয়ে আছে।

তোতোর ঘুম খুব গাঢ়।

ঘুমের মধ্যে ও রোজ স্বপ্ন দেখে, দেশে একটা সত্যিকারের গণজাগরণ হয়েছে। ভালর জন্যে, সত্যিকারের ভালর জন্যে ; শুধুমাত্র ভোটের জন্যে বা গদির জন্যে নয়, কোনও বিশেষ দল বা মতের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয় ; দেশের প্রত্যেকটি লোকের ভালর জন্যে।

তোতোর ঘুমের মধ্যে কার্ল মার্কস্, লেনিন, মাও-সে-তুং, হো-চি-মিন, ফিডেল ক্যাস্ট্রো, চে'গুয়েভারা এবং আরও অনেকের মুখ, তাদের কথা, তাদের বইয়ের লাইন তার চোখের সামনে বার

BanglaBook.org

বার ঘোরাফেরা করে। তোতো এখনও ভাবছে, তোতো এখনও বুঝতে পারছে না—এদের মধ্যে কে ঠিক ? কাকে ওর গুরু করবে ও ?

তোতো বিশ্বাস করে, দেশের ভাল একমাত্র সত্যিকারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোনও গণজাগরণের মধ্যে দিয়েই আসতে পারে। অশিক্ষিত দেশের লোক ঠকানো ভাঁওতা দিয়ে নয়। অন্য সব সিসটেমে ঘুণ ধরে গেছে।

কিন্তু মাঝে মাঝে ওর আবার সন্দেহ হয়। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারলে ও খুশি হত।

সারাদিন ও যা ভাবে এবং যা পড়ে, যে ভাবনা নিয়ে নিজের সমস্ত মনকে ও ট্রাক্টরের মতো চষে ফেলে, রাতেও সেই সব ভাবনার রণ-পা চড়ে তার এই সামান্য অবকাশের ঘুমের মধ্যে সে ঘুরে বেড়ায়। তোতো এখনও জানে না, তোতো ঠিক কি না ; কিন্তু তোতো তার বন্ধুদের, কমরেডদের উপর আস্থাবান।

তোতো বিশ্বাস করে যে, আমাদের দেশে শিগগিরিই একটা ওলোট-পালোট ঘটবে আর সে ওলোট-পালোট ঘটাবে তার মতো তরুণরাই। বুড়োগুলোর সব ভীমরতি ধরেছে। ওগুলোকে দিয়ে আর কিছু হবে না এ পোড়া দেশের। ওদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরে গেছে। সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকে গেছে। ও সর্ষে ঝেড়ে লাভ নেই।

তোতো বিশ্বাস করে, সব সময়ে বিশ্বাস করে, ওরা সবাই মিলে পুরনো পৃথিবীটার রং ফেরাবে। ওরা ফেরাতে পারবে।

রাতে হোটেলের লাইটহাউসের আলোটা নিঃশব্দে ঘুরে যাচ্ছিল। সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর বালির উপর নুলিয়াদের দূরের মাছ-রাখা খড়ের ঘরের উপর।

হোটেলের বন্ধ দরজায় আলোটা নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে কী যেন খুঁজছিল। সারারাত নিজের তাগিদেই আলোটা চুপিসাড়ে পা টিপে টিপে দরজায় দরজায়, প্রতি ঘরে ঘরে কী যেন খুঁজছিল।

আলোটা যেন কী হারিয়ে ফেলেছিল।

৮

কানা বাজটা চুপ করে সেই ভাঙা লাইটহাউসের উপরে বসেছিল।

তখনও সূর্য ওঠেনি।

নুলিয়াদের নৌকোগুলো একে একে ঢেউয়ের মাথায় উঠে নেবে, ডুবে ভেসে, মাঝ-সমুদ্রের দিকে চলেছে।

জয় ঝাউবনের মধ্যে লাইটহাউসের পাশে একটা উঁচু বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের নৌকো ভাসানো দেখছিল।

একটা নৌকো প্রথম দিকের অনেকগুলো ঢেউ নির্বিঘ্নে পেরিয়ে অনেকখানি ভিতরে চলে গেছিল। এমন সময় একটা বিরাট ঢেউ এসে নৌকোটাকে একেবারে উল্টে দিল।

সাদা টুপি মাথায় নুলিয়া দুটি প্রথমে ঢেউয়ের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরই আবার দেখা গেল নৌকোটাকে। একজন নুলিয়ার হাতের দাঁড়টা ঢেউয়ের তোড়ে হাত-ছাড়া হয়ে গিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। সে তখন সেই দাঁড় ধরবার জন্যে নৌকো ছেড়ে সাঁতরে আসতে লাগল ঢেউয়ের ওঠা-নামার মধ্যে।

অনেকক্ষণ পর সে সেই হারানো দাঁড়টা উদ্ধার করল এবং অনেক পরিশ্রম করে নৌকোয় গিয়ে পৌঁছল।

তারপর দু'জনে মিলে পরম বিক্রমে পর পর কয়েকবার দাঁড় বাইল।

কিন্তু পরক্ষণেই আর একটি ঢেউ এসে ওদের আবার উল্টে দিল। এবারে দ্বিতীয় নুলিয়াটি এবং তার দাঁড় নৌকো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'ধারে ছিটকে পড়ে গেল। অশান্ত ঢেউয়ের মাথায় প্রথম নুলিয়াটি নৌকোটাকে কোনও রকমে একা একা ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল ; এবং এবারে

BanglaBook.org

দ্বিতীয়জন সাঁতরাতে লাগল—ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে ঢেউয়ের গভীর থেকে তার দাঁড় উদ্ধার করতে। কতক্ষণে তার সঙ্গী দাঁড় হাতে ফিরে আসে সেই আশায় ও প্রতীক্ষায় ক্যাটামেরনটিকে কোনও রকমে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল প্রথম নুলিয়াটি।

জয়ের হঠাৎ কেমন মনখারাপ হয়ে গেল। বারে বারে ঢেউয়ের তোড়ে উল্টে যাওয়া ক্যাটামেরণের সঙ্গে, ওদের হারিয়ে যাওয়া দাঁড়গুলোর সঙ্গে, অপরাজেয় অথচ ক্লান্ত নুলিয়াদের সঙ্গে ওর নিজেকে বড় একাত্ম মনে হল । জয়ের হঠাৎ মনে হল, আমরা সবাই-ই এক-একজন নুলিয়া, যদিও আমরা ক্যাটামেরণে চড়ে সমুদ্রে মাছ ধরি না।

কানা বাজটা চুপ করে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিল।

চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে কেউ কোথাও নেই দেখে জয় মাটিতে পড়ে থাকা একটা শুকনো ঝাউয়ের ডাল তুলে নিয়ে বাজটার দিকে ছুঁড়ে মারল।

জয় ভেবেছিল, বুড়ো বাজটা উড়ে যাবে। ভেবেছিল, বাজটা সমুদ্রের দিকে চলে যাবে—যেখানে ঢেউ, যেখানে ভয়, যেখানে ডানা থামাবার উপায় নেই, যেখানে কেবলই উড়তে হয়—হয় উড়তে হয়, নয়তো মরতে হয় ; অথচ সেখানে মুক্তির নিরঙ্কুশ আনন্দ। নয়তো, জয় ভাবল, বাজটা পারের দিকে উড়ে যাবে—অন্য কোনও ঝাউবনে, আরও কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে । সেখানে হয়তো তাকে অন্য কোনও পুরনো ঝাউগাছের মাথায় কোনও শক্তিশালী বাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তার স্থান করে নেবার জন্যে ; হয়তো সেখানে রক্তপাত ঘটবে, কিন্তু হয়তো সেখানে গিয়ে সে এই নিশ্চিন্ত একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচবে।

কিন্তু আশ্চর্য ! বাজটা কোনওদিকেই উড়ল না, বাজটা একবার কেঁপে উঠল শুধু। ওর ডানা দুটো একবার ঝাপটাল। পরিষ্কার বোঝা গেল, বাজটা ভয় পেয়েছে।

জয় আরেক টুকরো কাঠ ছুঁড়ে মারল।

এবার কাঠটা বাজটার একেবারে গায়ের কাছে গিয়ে পড়ল। বাজটা একবার চিঁ-হি-হি করে যুদ্ধের ঘোড়ার মতো ডেকে উঠল। জয়ের মনে হল এইবার বাজের মধ্যে কোনও নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে গেছে। এবার ও শুধু উড়বেই যে তাই নয়, ও হয়তো জয়কে ওর তীক্ষ্ণ ঠোঁট আর ধারালো নখ নিয়ে আক্রমণও করে বসবে।

কিন্তু না, আশ্চর্য ! পুরনো বাজটা একবার ডেকে উঠে ওর বিরাট সোনালি ডানা দুটো নির্লজ্জের মতো গুটিয়ে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে পিছনে হেঁটে হেঁটে ভাঙা লাইটহাউসটার আরও ভিতরে ঢুকে অপমানের অন্ধকারে মিশে গেল।

জয় অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওদিকে। অনেকক্ষণ ধরে বাজটাকে বোঝবার চেষ্টা করল।

তারপর বিষণ্ণ মনে বালিয়াড়ি থেকে নেমে ঝাউবনের মধ্যের পথ দিয়ে দূরের টিলার দিকে হেঁটে চলল। যেদিকে মুত্তেলামা আর টোটম্মার মন্দির আছে।

ঝির-ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। সূর্যটা সমুদ্র ও আকাশ লাল করে পূবে সবে মাথা উচিয়েছে। ঝাউবন আর কাজুবাদামের বনে ঠাণ্ডা বালির উপর হাঁটতে খুব ভাল লাগছে। এখানে ওখানে মাঝে মাঝে কেয়াঝোপের মতো বিরাট বিরাট ঝোপ হয়েছে এই সমুদ্রপারে, দু-মানুষ তিন-মানুষ সমান উঁচু। এদিকে ওদিকে দুটো-একটা বুনো নিমগাছ। হাওয়ায় ওদের ফিনফিনে পাতা কাঁপছে। কতগুলো টিলার উপরে তালগাছের ঘন সন্নিবিষ্ট জঙ্গল।

জঙ্গলে দুটো-একটা টিয়া, একঝাঁক ময়না উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। চিলগুলো ঘুমোচ্ছে এখন। দুপুরবেলায় ওদের কান্না শুরু হবে। মাঝে মাঝে বালির ঢিবি থেকে গেছো তক্ষক ডেকে উঠছে—ট্যাক্ ট্যাক্ ট্যাক্ ট্যাক্। শুকনো দোলার উজ্জ্বলতা থেকে উঠে এসে নিঃশব্দে একটি সোনালি কেউটে কেয়াঝোপের সুগন্ধি অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে।

জয় দাঁড়িয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল।

জয় হাঁটতে হাঁটতে চারিদিকে তাকাল। নাক ভরে সকালের সুন্দর হাওয়ার গন্ধ নিল ; কান ভরে পাতার ফিসফিস, পাখির ডাক, প্রজাপতির ডানার ফরফরানি শুনল। দূরে তালবন ঝাউবনে ঘেরা কোনও গ্রাম থেকে একটা অসময়ের কোকিল ডেকে উঠল।

BanglaBook.org

হাঁটতে হাঁটতে জয়ের মনে হল যে, পৃথিবীতে যারা থাকি আমরা, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমাদের সব কিছু নোংরা ও পুরনো হয়ে গেলেও পৃথিবী কিন্তু ঠিক সেই রকমই সুন্দর আছে ও থাকবে।

এই ভোরের বাতাস, এই আলো, এই পাখির ডাক, এই শান্ত আদিগন্ত নির্লিপ্ত, সব কিছুই থাকবে। পৃথিবী সে রকম আছে বলেই বোধহয় এখনও একা একা পৃথিবীর বুকে হাঁটতে এত ভাল লাগে। মনের সব শূন্য কোষগুলি এখনও এই সুন্দর নির্জনতায় এলে কানায় কানায় ভরে ওঠে। তোতোরা যে সমাজই গড়ুক না কেন, পৃথিবী এমনই থাকবে, তার উপর সকলেরই সমান দাবি থাকবে ; সকলেই এমন করে মাঝে মাঝে নির্জনতায় স্বাধীন নিশ্বাস ফেলে আনন্দে শিউরে উঠবে।

মুত্তেলামা আর টোটম্মার মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে রোদ উঠে গেল। এখনও রোদ গরম হতে দেরি আছে।

মুত্তেলামার মন্দিরের সামনে একজন স্থানীয় মেয়ে একটা ডালিতে ফুল আর কী সব সাজিয়ে বসেছিল। পরনে লালরঙের শাড়ি। এক কোমর খোলা চুল। সে চুপ করে একা পাথরের উপর বসে মন্দিরের দিকে মুখ করে আছে।

পাছে মেয়েটি বিরক্ত হয়, জয় সেজন্যে মন্দিরটা ঘুরে একটু দূর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। এমন সময় মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল, কে ? চ্যাটার্জি সাহেব না ?

জয় মুখ ফিরিয়ে দেখল, উপমন্যা। একেবারে একটি এদেশি মেয়ের পোশাকে মন্দিরের সামনে বসে।

জয় এগিয়ে যেতেই উপমন্যা উঠে দাঁড়াল।

প্রথম সকালের নরম রোদ ওর চিকন মসৃণ কালো গায়ে পিছলে যাচ্ছিল। ওর সুন্দর কালো চোখ দুটিতে সকালের স্নিগ্ধ প্রশান্তি জড়িয়ে ছিল। জয়ের মনে হল, উপমন্যাকে শাড়ি পরা অবস্থায় যত সুন্দর দেখাচ্ছে, সুইমিং কস্ট্যুম পরে সেরকম সুন্দর দেখায় না।

জয় হাসতে হাসতে বলল, ব্যাপারটা কী ? মেমসাহেবের এত পুজো কীসের ?

উপমন্যা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমার মধ্যে মেমসাহেবিটা কোথায় দেখলেন ? আজ যে আমাদের পুজোর দিন। মুত্তেলামা আর টোটম্মার পুজো। আজ তো রাতে যাত্রা বেরোবে পথে পথে। আসবেন না দেখতে ?

জয় বলল, ইচ্ছে আছে নিশ্চয়ই আসার। কিন্তু আপনার এত পুজো কীসের জন্যে ? কোন হ্যান্ডসাম ইয়াংম্যানের জন্যে এত প্রার্থনা ?

উপমন্যা হেসে ফেলল।

কিন্তু ওর হাসিটা খুব করুণ দেখাল। সমুদ্রের পারে, কি জলের মধ্যে বিকিনি-পরা অনর্গল ইংরিজি-বলা মেয়েটিকে যেমন হাসিখুশি মনে হয়েছিল, এই মন্দিরের পূজারিণীকে তেমন মনে হল না।

উপমন্যা হাসল, বলল, আপনি বুঝি জানেন না, আমি বিবাহিতা ? ওই ক্যানিং ফ্যাক্টরির মালিক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার স্বামী। আমার বাবা নন—স্বামী। ফাদারকেও কথাটা বলেছিলাম, ফাদার পাউন্ড বিশ্বাস করেননি ; উনি বলেছিলেন, এখনও বলেন যে, আমি ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছি। অথচ কথাটা ঠাট্টা নয়।

কথাটা জয়ের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করল না। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ; তারপর বলল, আপনি এখনি ফিরে যাবেন ? তাড়া আছে ?

উপমন্যা বলল, না, তাড়া নেই, বসুন না পাথরে, একটু গল্প করা যাক। আমি এখানে এসেছি অনেকক্ষণ—সূর্য ওঠারও আগে।

জয় বলল, দেবীকে কী বললেন ?

উপমন্যা বলল, পুজো দিলাম।

পুজো দিলেন তো দেখতেই পাচ্ছি। ঠাকুরকে কী বললেন ? কিছু বলার বা জিজ্ঞেস করার জন্যেই তো সকলে মন্দিরে যায়। কী বললেন বলুন না ?

BanglaBook.org

উপমন্যা লাজুক মুখে হাসল।

আগের দিন জয়ের কেন যেন মনে হয়েছিল যে, উপমন্যার লজ্জা নেই। আজকে এই পোশাকে, এই হাসিতে শান্ত উপমন্যাকে ভীষণ লাজুক বলে মনে হল।

উপমন্যা বলল, ঠাকুরকে বললাম যে, আমি ঠিক কী চাই, কী আমার চাওয়া উচিত তা যেন আমাকে বলে দেন উনি।

জয় হো হো করে হাসল ; বলল, ঠাকুর নিজেই কি জানেন তিনি কী চান ?

উপমন্যাকে গম্ভীর দেখাল ; বলল, সব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা ঠিক নয়। ঠাকুরকে বললাম যে আমার বয়স তো অনেক হল, এখনও...।

জয় বলল, কত বয়স হল ?

উপমন্যা বলল, পঁচিশ।

জয় বলল, তাহলে তো বুড়িই হয়ে গেছেন।

উপমন্যা হেসে ফেলল ; বলল, শুনুন না, বললাম বয়স তো পঁচিশ হল, এখনও জানলাম না আমি ঠিক কী চাই—কীসের এই অশান্তি আমার। দেখুন চ্যাটার্জি সাহেব, একজন খুব গরিব অশিক্ষিত নুলিয়ার মেয়ে—অনেক কষ্ট করে মিশনারী স্কুল-কলেজে পড়ে বি-এ পাস করেছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল আমি সমাজের মই বয়ে উপরে উঠব, আমি বড়লোক হব তাই আমি তেষট্টি বছরের নিঃসন্তান বিপত্নীক রায়-নাইডুকে বিয়ে করলাম এক কথায়।

আমি তো জীবনে এই-ই চেয়েছিলাম।

ব্যাপারটা কী জানেন, আসলে কোনও সমাজেই কে কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে কেউ কখনও মাথা ঘামায় না। তাই না ? কে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে তার উপরেই সব। গন্তব্যটাই আসল।

আমি বড় বাড়ি, বড় গাড়ি, ভাল শাড়ি-গয়নার মধ্যে দিয়ে উপরে যেতে চেয়েছিলাম।

জয় উপমন্যার কথার কোনও উত্তর দিল না। চুপ করে রইল।

উপমন্যা বলল, আজকাল আর কাউকেই তেমন ভাল লাগে না। নিজেকেও ভাল লাগে না। যদি কাউকে হঠাৎ ভাল লেগে যায়, তবে বড় ভয় করে। ভীষণ ভয় করে। কী করব বুঝতে পারি না। তাই মুত্তেলামা আর টোটম্মাকে জিজ্ঞেস করি মাঝে মাঝে এসে, এমনি একা একা। আমাকে জানাতে বলি আমি কী চাই ; সত্যি সত্যি আমি কী খুঁজে বেড়াই ? জানেন চ্যাটার্জি সাহেব, আমার মনে হয়, আমরা—মানে আমি, আপনি—কোনও মানুষই সম্পূর্ণ সুখী নই। জীবনে কোনও মানুষই যা চায় তাই পায় না।

সুখ যেন একটা আখ-বোঝাই গরুর গাড়ি। আমাদের সামনে সামনে গরুর গাড়িটা ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর করতে করতে যায়—আমরা মাঝে মাঝেই পিছন থেকে জোর করে দুটো-একটা আখ টেনে নিই, দু-এক টুকরো সুখ কেড়ে নিই। গাড়োয়ান লাঠি উঁচিয়ে মারতে আসে বার বার। আমরা সেই চুরি-করা আখ পরমানন্দে চিবোই। পরক্ষণেই আবার শূন্যহাতে আখের বোঝার দিকে চেয়ে থেকে পথ চলি। ধুলোর মধ্যে, রোদের মধ্যে, কাঁটার মধ্যে পথ চলি। তাই না ?

উপমন্যার এই কথায় জয় চমকে উঠল। ও আশা করেনি এমন গুছিয়ে সহজভাবে এমন একটি কঠিন কথা উপমন্যা বলে ফেলবে।

উপমন্যার মুখোমুখি বসে থেকে, সেই সকালে জয়ের মেনে নিতে ইচ্ছে করল যে আমরা বোধ হয় প্রত্যেকে, সবাই-ই টুকরো টুকরো মানুষ। বাইরের কারও কাছেই আমরা সম্পূর্ণভাবে সমগ্রভাবে প্রকাশিত হই না। প্রেমিক তার প্রেমিকাকে সম্পূর্ণভাবে জানে না, বাবা জানে না ছেলেকে, স্বামী জানে না স্ত্রীকে। হয়তো আমরা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে জানি না নিজেকে। সেদিন স্নানরতা উপমন্যাকে দেখে তার সম্বন্ধে জয়ের যে ধারণা হয়েছিল এখন সে ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

উপমন্যা আর জয় চুপ করে সেখানে বসে রইল। নীচের পথ দিয়ে ভোরের প্রথম বাসটা শহরের দিকে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পর উপমন্যা বলল, চলি।

BanglaBook.org

জয় উঠে দাঁড়াল, বলল, আচ্ছা।

উপমন্যু পাহাড়ের নীচে ওদের বাংলোয় যাবার পথ ধরল।

জয় আরও কিছুক্ষণ বসে রইল সেখানে। মুণ্ডেলামা আর টোটম্মার ছোট মন্দিরে সমুদ্র থেকে হাওয়া এসে সজোরে আছড়ে পড়ছিল। বেলা যত বাড়ে হাওয়াটার জোর তত বাড়ে। শূন্য মন্দিরের গর্ভ থেকে হিস হিস শব্দ উঠছিল। জয় কান পেতে শুনল। সেদিনের মতো তার আবারও মনে হল, হাওয়াটা ফিস-ফিস করে কী যেন বলছে। বলছে—আছে, আছে। কিন্তু আবার পরক্ষণেই বলছে, নেই, নেই।

জয় পাহাড় থেকে নেমে এল।

আজকে গ্রামের সমস্ত দোকানে দোকানে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। বাজারের পাশের নুলিয়া বস্তিতে সকাল থেকে বাজনা বাজছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভাল জামা-কাপড় পরেছে। বুড়ির চুলওয়ালা গোলাপি-রঙা বুড়ির চুলের রাশ নিয়ে পথের পাশে বসে বাচ্চাদের লুব্ধ করছে। নুলিয়া বস্তিতে নানারকম রঙিন ও সাদা পতাকা ওড়ানো হয়েছে। নুলিয়া যুবকরা বাজারের পানের দোকানে এসে হয় ছোটকঁলু টানছে, নয়তো সময় নেই অসময় নেই মুখে মার্বল-বসানো মফস্বলের সোডার বোতল থেকে সোডা খাচ্ছে। যখন-তখন সোডা খাওয়াটা এই পুজোর দিনে একটা বিলাসিতা বলে ধরে নিয়েছে ওরা।

সমস্ত মিলিয়ে আজ রাতে যে এখানে দারুণ একটা কাণ্ডকারখানা হবে তা বোঝা যাচ্ছে। দুদিকে দেখতে দেখতে বাজারের মধ্যে দিয়ে জয় হাঁটতে লাগল।

একটু এগোতেই দেখল, ঘণ্টু ঘোষ একটা সেলুন থেকে বেরোলেন।

জয় বলল, এ কী, এখানে কী ?

ঘণ্টুবাবু হাসলেন ; বললেন, চুলটা ছেঁটে নিলাম। যাবার তো সময় হয়ে এল। ফিরে গিয়েই তো দোকানে বসতে হবে।

জয় বলল, তা তো বুঝলাম, কিন্তু এমন কদমছাঁট লাগালেন কেন ? হোটেলের উর্দিপরা নাপিতকে বললেন না কেন ?

ঘণ্টু ঘোষ বললেন, ব্যাটা ভারী বদমাইস। ও তো জ্যোতিষী। একটু করে কাঁচি চালায় আর একটু করে কপালের রেখা দেখে ভাগ্য বলে। সেদিন হিতুর চুল কাটছিল। হিতুকে বলল, আপনি লোক খুব ভাল, আপনার দিল খুব বড়, ইত্যাদি। হিতুটা এমন ইডিয়ট যে প্রশংসা শুনে পাঁচ টাকা বকশিশ পর্যন্ত দিয়ে দিল। যত সব ভ্যাগাবন্ড তো আসে এখানে, খেয়েদেয়ে কাজ নেই নাপিতকে দিয়ে ভাগ্য গোনায় ! সত্যি কথা বলতে কী চাটুজ্জে, আমি ওই ওর ভয়েই এতদূর এই সকালে হেঁটে এলাম।

জয় হেসে ফেলল ; বলল, আহা গরিব লোক, না হয় একটু বকশিশই দিতেন।

—আহা তার জন্যে নয়, কী বলতে কী বলে বসত ! আমি ওইসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। পুরুষমানুষের আবার ভাগ্যগণনা কী ? পুরুষমানুষ নিজের ভাগ্য নিজে বদলায়।

জয় বলল, তা ঠিক।

ওরা দুজনে হোটেলের দিকে হেঁটে আসতে লাগল।

জয় বলল, মিত্তির সাহেবের কী হল ?

—ও বারান্দায় বসে আছে। বলে, কাল চলে যাব, একটু সমুদ্র দেখি আশ মিটিয়ে।

একটু পরে ঘণ্টু ঘোষ বললেন, আচ্ছা চাটুজ্জে, এই মিত্তিরকে তোমার কেমন লাগে বলো তো ?

জয় বলল, মানে ? উনি আপনার বন্ধু, অথচ আমাকে জিজ্ঞেস করছেন—কেমন লাগে ?

ঘণ্টু ঘোষ ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসলেন ; বললেন, এক ঘরে থাকলেই কি বন্ধুত্ব হয় ! ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রী এক ঘরে এক খাটে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, সবাই কি সবাইয়ের বন্ধু ? তুমি ছেলেমানুষ চাটুজ্জে, নিতান্তই ছেলেমানুষ।

—তাহলে আপনি মিত্তির সাহেবের বন্ধু নন ?

—বন্ধু ! আরে না না। ওর সঙ্গে আমি ঘুরে বেড়াই ওর গোপন কথাটা জানতে।

BanglaBook.org

—কীসের গোপন কথা ?

—ও সব সময় একটা সুখের ভান করে থাকে। শালার এত সুখ আসে কোত্থেকে বলো তো ? যা রোজগার করে তার সমস্তটার উপর ট্যাক্স দেয়, ব্যাঙ্কেও এমন কিছু জমায়নি। একমাত্র মেয়েটার বিয়ে দিল একটা ডাক্তার ছোকরার সঙ্গে—ছোকরার না আছে বাড়ি, না আছে গাড়ি, সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। জানি না, হয়তো ভবিষ্যৎ আছে। হিতু বলে, ছেলেটা সৎ। আরে ছেলেটা সৎ বলে তুই মেয়েটার হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিবি ? হিতু ব্যাটা সব সময় হাসে, সব সময় গান গায় গুনগুন করে, ব্যাটার নিশ্চয়ই কোনও একটা গোপন ব্যাপার আছে। বলে, আর দু' বছর কাজ করার পর রিটায়ার করব, বুঝলি ঘণ্টু, তারপর বেরিয়ে পড়ব স্বামী-স্ত্রী কুল্লু-স্পেশালে তীর্থভ্রমণে। অথচ রিটায়ার করলে ওর মাসে তিনশো টাকার বেশি আয় থাকবে না। তখন নাকি ও গাড়ি বেচে দেবে, হুইস্কি খাওয়া ছেড়ে দেবে, বুড়োবুড়ি নাকি তখন রিয়্যাল হানিমুনিং করবে।

ও ব্যাটা নিশ্চয়ই কোনও মক্কেল-ফক্কেলকে ধরে ফরেইন ব্যাঙ্কে ভাল ব্যালান্স জমিয়েছে। যাই বলো বাবা, রেস্ত না থাকলে সুখ থাকবে কোত্থেকে ? যাই হোক, ওর আসল ব্যাপারটা আমি আবিষ্কার করবই। এত সুখ ওর আসে কোত্থেকে ?

ও হাসে আর বলে, জানিস ঘণ্টু, আমার বুকের মধ্যে একটা ভল্টে আমি সোনার মতো সুখের রক্ত বোঝাই করে রেখেছি, আমি মরে গেলে তুই সেটা বের করে নিস।

জয় হাসছিল ; বলল, ওঁর সুখের রক্তর সঙ্গে হয়তো আপনার সুখের রক্তের গ্রুপ মিলবে না। হয়তো আপনার কোনও কাজেই লাগবে না।

ঘণ্টু ঘোষ বললেন, না, না, আমি ওর সুখের কাঙাল নই, আমি যথেষ্ট সুখী, আসলে ওর সুখের ধারাটা অন্যরকম বলেই জানতে ইচ্ছে হয়।

জয় বলল, আপনার সুখের রকমটা কেমন ?

ঘণ্টু ঘোষ জবাবে হঠাৎ করে কিছু বলতে পারলেন না।

তারপর একটু থেমে লাজুক মুখে বললেন, সকলে আমাকে সুখী বলে, তাই আমি সুখী।

—আপনি নিজে জানেন না আপনি সুখী কিনা ?

ঘণ্টুবাবু বললেন, ব্যাপারটা কী জানো চাটুজ্জে, আমরা হচ্ছি ব্যবসাদার লোক। যে সময়ে ওসব ভাবনা ভাবব, ততক্ষণে দু'পয়সা কামিয়ে ফেলব। সুখ কাকে বলে জানতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে সুখের বাবাকে সুদ্ধু সিন্দুকে পুরে ফেলব। আসলে ছোটবেলা থেকে লোকে যাকে সুখ বলে, তার উপর চেপে বসে টাকা কামিয়েছি, কখনও সময় পাইনি গদি ছেড়ে উঠে গদির নীচে তাকিয়ে আসল চেহারাটা দেখি। কিন্তু যদি কখনও সে সুখকে দেখতেও পাই, এটা জানি যে সেটা অন্যরকম সুখ, হিতু মিত্তিরের সুখের মতো নয়।

আর ওই যে তোমার নুলিয়াটার কী নাম যেন, চন্দ্রাইয়া না কী—হিতু বলে, ও ভীষণ সুখী।

সেদিন আমি বলছিলাম, তুই ওর সুখটা দেখলি কোথায় ? হিতু বলল, সুখটা দেখা যাচ্ছে না বলেই তো ও সুখী। বলল, তুই ওর মতো হাসতে পারিস ? ওর মতো ষাট বছর বয়সে ওরকম সাঁতার কাটতে পারিস ? তুই যে সেদিন দু'ঘণ্টা পা টিপিয়ে ওকে চার আনা পয়সা দিয়েছিলি, তা ওর মতো ঘৃণাভরে তুই ছুঁড়ে ফেলতে পারিস ? পারিস না। তুই এক নয়া পয়সাও ছুঁড়ে ফেলতে পারিস না, কারণ পয়সা লক্ষ্মী। হিতু বলে, জানিস ঘণ্টু, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে ওই ছুঁড়ে ফেলা। খেপলা জালের মতো সব কিছু ছুঁড়ে ফেলতে পারলে তবেই তুই সুখের মাছ পাবি। বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে শক্ত করে ছিপ হাতে বসে থাক—রুই, কাতলা এসে তোর কেঁচোই কখন খেয়ে যাবে, ফাতনা নড়তে পর্যন্ত দেখতে পাবি না। জীবনের শেষে এসে অপরিচয়ের সায়াহ্নকারে ফাতনা নড়ছে ভেবে হ্যাঁচকা টান মারবি, দেখবি সুখের মাছ তো ওঠেইনি, তোর কেঁচোও সাফ।

বলেই ঘণ্টু ঘোষ হাসতে লাগলেন। যেন হিতু মিত্তিরের দুর্বোধ্য কথা বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই হেঁয়ালির হিসাব রাখার।

জয়ও হাসছিল।

—যাই বলো চাটুজ্জে, হিতু মিত্তির একটা উন্মাদ। ওর সঙ্গে তবু ঘুরি, যদি ওর আসল সিক্রেটটা

BanglaBook.org

কখনও জানতে পারি এই আশায়। তবে একটা কথা বলব চাটুজ্জে, এই হিতেন মিত্তিরের মতো লোকগুলোই দেশটার সর্বনাশ করছে। যাকে-তাকে নাই দিয়ে মাথায় তুলছে। কিন্তু ও কোন বিশ্বাসে যে এ সব করছে, এটা আমি একদিন জানবই জানব।

৯

ব্রেকফাস্টের পর জয় চান করতে নেমেছিল।

আজ কী মনে করে তোতো সমুদ্রের পার অবধি এসেছে। তোতো তালপাতার ঘরে বসে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। মিসেস জেমস কুকুরটার সঙ্গে খেলা করছেন ভিজে বালিতে শুয়ে শুয়ে। জুডিথ একবার বালিতে, একবার জলে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

আজ সকালে সমুদ্রে আসতে আসতে তোতো বলছিল, বুঝলেন জয়দা, আপনার কথাটা নিয়ে ক্রমাগত ভাবছি। সেদিন থেকে।

আমরা সত্যিই খুব সহজে সব কিছুতে বিশ্বাস করি, কথায় কথায় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই, আসলে ব্যাপারটা সত্যিই এত সহজ নয়। বিশ্বাস আদৌ আছে কিনা, সেটাই ভাববার বিষয়।

জয় হাসতে হাসতে বলেছিল, কী হল, তোমার বিপ্লবে বিশ্বাস তা হলে নেই?

তোতো মুখ তুলে হাসল। বলল, আপনি একজন রিয়েল বুর্জোয়া।

জয় জবাব দিল না, হাসল।

তোতো বলল, আমি সেদিন যা বলেছিলাম তাতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এখন ভাবছি, কেবলি ভাবছি—পথ কোনটা? একটা কিছু যে করা দরকার, সে বিষয়ে সন্দেহ বা অবিশ্বাস নেই, কিন্তু যা করব তা কী? এবং কীভাবে? সেটাই ভাববার। মানে আপনার কথায় বলতে গেলে, কিছু করার আগে সেই কর্মপদ্ধতিতে সত্যিকারের বিশ্বাস আছে কি না সেটা আমার নিজেকে ভাল করে যাচাই করে নিতে হবে, জানতে হবে।

আমার কী মনে হচ্ছে এখন জানেন? স্থিরভাবে কিছু বিশ্বাস করার আগে ভাল করে ভাবা দরকার, পড়াশুনা করা দরকার, নিজের মতের উপর নিজে আস্থাবান হওয়া দরকার, নইলে অন্যকে বিশ্বাস করাব কি যে আমি ঠিক, আমরা ঠিক?

জয় হাসল, বলল, সে কথা ঠিক। তবে বেশি ভাবলে কোনও কিছু আর করা হয়ে উঠবে না। ওইখানে একটা পুরনো বাজ আছে, ও সারাজীবন শুধু ভেবেই গেল, কিছু করতে পারল না। কখনও উড়তে পারল না।

তোতো হাসল; বলল, না, আমি পুরনো বাজ নই, আমি নতুন বাজ। আমি উড়ব, ওড়ার জন্যেই আমি জন্মেছি, কিন্তু উড়ে যাবার আগে আকাশটা ভাল করে দেখে তবে উড়তে চাই।

জয় আবার হাসল; বলল, বুঝেছি, তা হলে তোমার আর ওড়া হল না। যে ওড়ার, সে না দেখেই উড়বে। আগে উড়ে পড়ো, তারপর দেখবে। যে ওড়েনি তার কাছ থেকে তুমি বরং আকাশের খবর নিয়ে উড়ে পড়ো। দেরি করলে আর ওড়া হবে না।

তোতো বলল, হবে—হবে।

জয় তোয়ালেটা পাতার ঘরের ছাদে রাখতে রাখতে বলল, কোনও বিশ্বাস একা একা বওয়া যায় না, তা জানো?

—মানে?

—মানে ফাদার পাউন্ড সেদিন বলছিলেন, ইটস লাইক এ রিলে রেস। য়্যু জাস্ট ক্যান্ট ক্যারি ইট অ্যালোন।

—ক্যারি হোয়াট?

—বিশ্বাস, বিশ্বাস। কে বা কারা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তার ওপর সব নির্ভর করে। দূরে কখনও কি তাকিয়ে দেখেছ, কারা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে? তারা কেমন দৌড়োয় তা তুমি খোঁজ নিয়েছ? তুমি কেমন দৌড়াও তাতে কিছু যায় আসে না, যে লাস্ট ল্যাপে দৌড়োবে তার

BanglaBook.org

উপর সব নির্ভর করছে। শেষের দৌড়ে হেরে গেলেই হার। এ দারুণ দৌড়।

তোতো যেন কী ভাবল, বলল, দূরে দেখব কী করে ? সমুদ্রের মধ্যে কিছু যে দেখা যায় না। সামনে যে শুধু বড় বড় ঢেউ।

জয় জোরে হেসে উঠল। বলল, ওইজন্যেই বলেছিলাম, সাঁতার কাটো, জলে নামো। সামনের ঢেউগুলো না পেরুলে দূরে কী আছে তা দেখবে কী করে ?

তোতো বলল, আমার কাছে একটা পাওয়ারফুল দূরবীন আছে।

—দূরবীন দিয়ে দূরের জিনিস দেখা যায়, কিন্তু মধ্যে ঢেউয়ের আড়াল পড়ে যাবে যে—দূরবীনে কাজ হবে না। তোমার আমার পূর্বসূরিরা আরাম চেয়ারে বসে দূরবীন দিয়েই সমুদ্র দেখতে চেয়েছিলেন, তাই দেখতে পাননি। ঢেউয়ে নামো, ফেনার বুজবুজ, ঢেউ ভাঙার প্রচণ্ড শব্দ, আন্ডার-কারেন্টের টান—এসব এড়িয়ে একটু এগিয়ে যাও, তখন যদি দেখতে পাও।

—আপনি দেখেছেন ?

—নাঃ।

—তবে ?

—তবে কী ?

—তবে জানলেন কী করে ?

—জানলাম, রোজ ঢেউয়ের রদ্দা খাচ্ছি, বালিতে আছাড় খাচ্ছি, নোনা জল খাচ্ছি, নোনাজলে কান ভরে যাচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে—এগোতে পারছি কই ? তবু চেষ্টা তো করছি। আমি পারিনি বলে তুমিও যে পারবে না তার কোনও মানে নেই, কেউ না কেউ পারবেই।

তোতো জবাব দিল না। চুপ করে জয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জয় আস্তে আস্তে জলে নেমে পড়ল।

চন্দ্রাইয়া একটা ডুব দিয়ে জয়ের পাশে ভেসে উঠল।

জয় বলল, আজ যে খুব দম দেখছি। সকালে কী খেয়েছ ?

চন্দ্রাইয়া হাসল ; বলল, কেন ? রোজ যা খাই—পোকাল ভাত, শুঁটকি মাছ, তেঁতুলের রস।

—তা হলে আজ এত বেশি ফূর্তি কীসের ?

—আমার রোজই ফূর্তি। পোকাল ভাত না খেয়ে পোলাও মাংস খেলে কি ফুর্তি বেশি হয় বাবু ? ফুর্তি হয় অন্য কারণে !

জয় সামনে একটা বড় ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে বলল, কী কারণে ?

—কারণ আমি ভাল নুলিয়া বলে।

—এখানের সকলেই তো নুলিয়া।

—তা বটে। কিন্তু সকলে আমার মতো ভাল নুলিয়া নয়। আমার সঙ্গে সাঁতার কেটে ছোকরারাও পারে না। আমি যা করি তা ভাল করেই করি। আমি ভাল করে করেছি বরাবর। সকলে জানে, আমি শুধু পোকাল খাই, অন্য সকলে যা খায় তাই খাই। কেউ জানে না, দেখতে পায় না বাবু, দু'বেলা পোকালের সঙ্গে আমি গর্বও খাই—কাঁচালঙ্কার মতো কচ কচ করে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই।

শুধু ভাত খেয়ে কি কোনও পুরুষমানুষ বাঁচে বাবু ? পোকাল খেয়েও বাঁচে না, পোলাও খেয়েও বাঁচে না ; পুরুষমানুষ তার গর্ব, তার নিজের উপর বিশ্বাসটুকু চিবিয়ে চিবিয়ে বেঁচে থাকে। ঠিক কিনা ?

জয় বলল, ঠিক।

পরক্ষণেই একটা বড় ঢেউ মাথার উপর ভেঙে পড়ল, জয় ডুব দিল। পানকৌড়ির মতো জল ছিটিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে জয় বলল, চন্দ্রাইয়া, তুমি তো ক্যাটামেরনে চড়ে ঢেউ পেরিয়ে রোজ সমুদ্রের ভিতরে যাও—ঢেউয়ের ওপারে কী আছে জানো ?

চন্দ্রাইয়া বলল, ঢেউয়ের ওপারে ঢেউ, তারপর আরও ঢেউ

—তা হলে লোকে যে বলে ঢেউ পেরলোই সমুদ্র শান্ত, সেখানে কোনও ভয় নেই ?

BanglaBook.org

চন্দ্রাইয়া হাসল ; বলল, এ কথা ঠিক নয়, বাবু। এ কথা ঠিক নয়।

—তা হলে লোকে বলে কেন ?

চন্দ্রাইয়া কী যেন ভাবল। তারপর জল কুলকুচি করে বলল, বোধ হয় ভয় ভাঙানোর জন্যে বলে। আসলে ভয়টাই তো সব। যার ঢেউয়ের ভয় ভেঙে গেছে, তার কাছে ঢেউ থাকলেও সমুদ্রকে শান্তই মনে হয়। যার ভয় ভাঙেনি, তার ভয় ভাঙাবার জন্যে, তাকে জলে নামাবার জন্যে বোধ হয় এসব বলে ।

জয় বলল, তাই বুঝি ?

চন্দ্রাইয়া উত্তর না দিয়ে জলের উপর চিত হয়ে শুয়ে রইল। জয় দেখল, ওর চোখ বন্ধ।

কিছুক্ষণ পর জয় বলল, কী হল ? আমাকে ডুবিয়ে মারবে নাকি ? তোমাদের এ সমুদ্র ভাল না, যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘূর্ণি ওঠে, আন্ডার-কারেন্ট আসে—তুমি চোখ বন্ধ করে রয়েছ কেন ?

চন্দ্রাইয়া চোখ খুলে দু'পায়ে জল কেটে সোজা হয়ে দাঁড়াল দু'মানুষ সমান গভীর জলের মধ্যে। বলল, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি আজ গত চল্লিশ বছর ধরে রোজই স্বপ্ন দেখি সূর্যের আলোয় জলের উপর ভেসে ভেসে।

—কী স্বপ্ন ?

—আমি আমার নিজের ক্যাটামেরনে চড়ে সমুদ্রে সমুদ্রে লাল ভেটকি ধরছি।

—তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো যে, তুমি নিজের পুঁজি থেকে ক্যাটামেরন কিনতে পারবে ? বয়স তো ষাট পেরিয়ে গেল !

চন্দ্রাইয়া ওর ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল ; বলল, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। তা ছাড়া আমার সত্যিকারের বয়স মাত্র দু'বছর।

—কী বললে ?

—আমার সত্যিকারের বয়স মাত্র দু'বছর।

—তার মানে ?

—মানে পুরুষমানুষের বয়স দিন বা তারিখ গুনে হয় না, জীবনে কে কতবার হেরেছে তা হিসেব করে হয়। আমি জীবনে মাত্র দু'বার হেরে গেছি। তাই আমার বয়স দু'বছর। একবার একজন নুলিয়ার কাছে সাঁতারে হেরে গেছিলাম। আর একবার এই হোটেলেই বেড়াতে-আসা একজন অল্পবয়সী আমেরিকান মেমসাহেবের কাছে। এই দু'বার। আমার মাত্র দু'বছর বয়স বাবু।

বলে চন্দ্রাইয়া হো হো করে হাসল।

জয় ভেসে থাকতে থাকতে পারের দিকে তাকাল।

দূরে গেস্ট হাউসটা ছবির মতো দেখাচ্ছে। ওরা সাঁতরে বেশ অনেকখানি চলে এসেছে। খানিকটা দূরে ডান দিকে প্রায় ব্যাকওয়াটারের কাছাকাছি কী যেন একটা ঘটেছে। দু-একজন করে লোক এসে দাঁড়াচ্ছে। ছোট ছোট কালো কাঁকড়ার মতো, বালির উপর একটা জায়গায়। আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে।

হু হু করে হাওয়া বইছে। সূর্যটা মাথার উপর। জলের উপরে, ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের তলায় তলায় বুজ-বুজ করা স্বচ্ছ ফেনার শরীরে সূর্যটা যেন হাজার হাজার সূর্য হয়ে ভেঙে পড়ছে—ছড়িয়ে যাচ্ছে। দুটো সি-গাল ঢেউয়ের মাথায় ছোঁ মেরে মেরে সার্ডিন ধরছে—সার্ডিনের রুপোলি রং রোদে ঝিকমিক করে উঠছে। দূরের তালবন বাউবন থেকে দুপুরের চিলের কান্না হঠাৎ-হঠাৎ বাঁশির মতো ভেসে আসছে।

চন্দ্রাইয়া হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, বাবু, ওদিকে চল, ওদিকে চল, এক্ষুনি ঘূর্ণি উঠবে এখানে।

প্রাণপণ সাঁতার কেটে জয় বাঁদিকে পারের দিকে এগোতে লাগল ; স্রোত যেন কিছুতে ওকে আসতে দেবে না এদিকে। জয় ওর হাত-পায়ের সমস্ত জোর দিয়ে প্রাণপণ জল কাটতে লাগল। জল কাটতে কাটতে পারের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

এমন সময় জুডিথ পারে দাঁড়িয়ে মুখের কাছে দু'হাত এনে কী যেন চেঁচিয়ে বলল জয়কে। জয় মাথা উঁচিয়ে শুনবার চেষ্টা করল। ভাল শুনতে পেল না। জুডিথ বলল, সামওয়ান...তারপর বলল,

BanglaBook.org

সামওয়ান ইজ ডেড—আ ড্রাউনিং অ্যাকসিডেন্ট... ।

চন্দ্রাইয়া জয়ের অনেক আগে বড় বড় হাতে জল কেটে পারে এসে উঠল। জয়ও উঠে এল। জয়ের পা দুটো কাঁপছিল থর-থর করে, ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে।

জুডিথ তোতোকে বলল, লেটস গো অ্যান্ড হ্যাভ আ লুক।

তোতো বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল ; বিরক্ত গলায় বলল, লুক অ্যাট হোয়াট ?

জুডিথ বলল, লুক অ্যাট দ্যা ডেড।

তোতো রাগ-রাগ গলায় বলল, আই হেট টু লুক অ্যাট দ্যা ডেড।

বলে তোতো হোটেলের দিকে উঠে যেতে লাগল বালি ভেঙে। তোতো চলে গেল।

জয়েরও ইচ্ছে করছিল ঘরে গিয়ে চান করতে, কিন্তু জুডিথ ও মিসেস জেমসের পীড়াপীড়িতে ওদের সঙ্গে যেতেই হল।

চন্দ্রাইয়া পারে উঠেই দৌড়ে গেছিল ওদিকে—জল থেকে যেখানে ভিড় জমতে দেখেছিল বালির উপর।

সেই জায়গাটিতেই ভিড়টা আরও ঘন হয়েছে।

ওরা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেল। জুডিথ আগে আগে যাচ্ছিল, ও আগেই দৌড়ে গিয়ে পৌঁছল।

পৌঁছেই জুডিথ চেঁচিয়ে উঠল।

জয় অন্য লোকদের কাঁধের ফাঁক দিয়ে পুলিশের পাগড়ির কোণ ঘেঁষে তাকাল। তাকাতেই জয়ের বুকটা ধক্ করে উঠল। দেখল—উপমন্যা। সেই কালো সুইমিং কস্ট্যুম পরে শুয়ে আছে চিত হয়ে। ওর কাজললতার মতো চোখ দুটি বন্ধ। জল খেয়ে পেটটা ফুলে ওঠায় ওর ফিগারটা দারুণ বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। মাথার অর্ধেক চুল ছেঁড়া ও জট পাকানো। উপমন্যাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ও কি ঢেউয়ের তলায় ওর সেই উজ্জ্বল আবিষ্কারকে ভালবেসে ফেলেছিল ? ঢেউয়ের তলার সবুজ স্বচ্ছ আলোয় ও কি ওর সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল ?

কতকগুলো লোক আঙুল উঁচিয়ে উঁচু পারের দিকে কী দেখাচ্ছিল। জয় সেদিকে চেয়ে দেখল। দুজন পুলিশ অফিসার ফাদার পাউন্ডকে সঙ্গে করে থানার রাস্তায় যাচ্ছে। বোধ হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

জয় অনেকক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। লিন্ডা, জুডিথ এবং অন্যান্য সকলে মিলে ইংরিজি, তেলেগু, বাংলা আর হিন্দিতে মিশিয়ে যে চিৎকার করছিল, তার কিছুই জয়ের কানে যাচ্ছিল না। জয়ের কানে সেই সকালে শোনা উপমন্যার কথাগুলো বার বার বাজছিল—সুখ যেন আখ-বোঝাই একটা গরুর গাড়ি। মাঝে মাঝে দুটো-একটা আখ আমরা জোর করে টেনে নিই—পরক্ষণেই আবার ধুলোর মধ্যে, রোদের মধ্যে, কাঁটার মধ্যে চলি।

জয় মনে মনে বলল, চলতে চলতে তুমি এত তাড়াতাড়ি থেমে গেলে, উপমন্যা ?

মিসেস জেমস্ ও জুডিথ চন্দ্রাইয়ার সঙ্গে ফিরে গেছে।

জয় একা একা ফিরে আসছিল হোটেলের দিকে। একটু আগে উপমন্যাকে ওরা মর্গে নিয়ে গেছে। উপমন্যার বৃদ্ধ রোগা চশমা-পরা লম্বা স্বামী রায়-নাইডু চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর চোখে কোনও ভাবান্তর ছিল না। মাথায় কোনও ভাবনা ছিল কি ছিল না, তাও বোঝা গেল না।

একা একা হাঁটতে হাঁটতে জয়ের হঠাৎ সীমার কথা মনে পড়ল। হঠাৎই। উপমন্যার মৃত্যুর সঙ্গে সীমার ভাবনার কোনও মিল নেই। সীমা সুখে আছে। রোজ জোজোর সঙ্গে বেড়াচ্ছে, চীনা রেস্তোরাঁয় খাচ্ছে, হিন্দি ছবি দেখছে, পথে পথে দু'হাত নাড়িয়ে অনর্গল কথা বলে হাঁসের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে—কস্তুরীমৃগের মতো নিজেদের গন্ধে নিজেরা পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জোজো সীমাকে নিয়ে একজন নুলিয়ার মতো মাঝ-সমুদ্রে চলে গেছে। এখন একমাত্র জোজোই ওকে আবার তীরে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পারে জয়ের কাছে। সীমা একা একা আর জীবনে কখনও তীরে ফিরতে পারবে না। একা ও ফিরতে গেলেই, জোজোর নুলিয়ার মতো শক্ত থাবা ছেড়ে দিলেই, উপমন্যার মতো সীমাও জল খেয়ে ডুবে মারা যাবে।

BanglaBook.org

তবু সীমা যা-ই করুক, ভুল করেই করুক কি জেনেশুনেই করুক—সীমা তার সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক না কেন, জয় এখনও সীমাকে ভালবাসে। জয় এখনও চায়, সীমা যেন সুখী হয়, সীমার চারপাশে জয়ের কল্যাণ কামনার পরিমণ্ডল যেন সব সময় তাকে ঘিরে থাকে।

দুপুরের নির্জন সমুদ্রতীরে হু-হু হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওর অভিমানের মতোই ফুলে ফুলে ওঠা সমুদ্রের দিকে জয় তাকিয়ে রইল।

একটা সি-গাল ওরই মতো একা একা ওর মাথার উপর ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল।

জয় নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পেল, পৃথিবীতে ভালবাসা নেই। এই রোদে দাঁড়িয়েও ওর কেমন শীত করতে লাগল। জয়ের বিশ্বাস ভুল, একেবারে ভুল। ভালবাসা থাকলে জয়ের অন্তরের সমস্ত আকুতি-ভরা ডাক সীমা শুনতে পেত।

জয়ের মনে হল, মানুষের হৃদয় দিয়ে কিছু বললে দূরের লোক তা শুনতে পায় না, বুঝতে পারে না। হয়তো কাছ থেকে বললেও শুনতে পায় না, হয়তো তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় মাত্র, হয়তো সে শুধুমাত্র বোঝে যে তাকে কিছু বলা হচ্ছে, কিন্তু কী বলা হচ্ছে তা সে বুঝতে পারে না।

নীরব চোখের ভাষা, নরম হৃদয়ের কথা সব তামাদি হয়ে গেছে, বানচাল হয়ে গেছে। ব্যথাতুর হৃদয়ের চেয়ে জলে ভেজা চোখের চেয়ে একটা অ্যাম্‌প্লিফায়ারের দাম আজকাল অনেক অনেক বেশি হয়ে গেছে।

১০

বিকেলে রুম-বেয়ারা চায়ের সঙ্গে দুটি চিঠি নিয়ে এল।

একটা অফিসের চিঠি। ছুটি এক্সটেন্ড করা সম্ভব নয় তা জানিয়ে। অন্যটি সীমার চিঠি। ইনল্যান্ড লেটারে।

ডিভানে বসে চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে জয় ভাবছিল। এমন সময় ঘণ্টু ঘোষ জয়ের খোলা জানালায় এসে দাঁড়ালেন। বললেন, খবর শুনেছ চাটুজ্জে ?

জয় চমকে উঠল, চামচসুদ্ধ হাতটা কেঁপে গেল ওর। একটু চা ট্রেতে চলকে পড়ল। বলল, কী খবর ?

—তোমার ফাদারের কীর্তি !

—আমার বাবার কথা বলছেন ?

—আরে ছি ছি, তুমি একটা···। তোমার বাবা নয়—ফাদার পাউন্ড !

—কী—কী কীর্তি ?

—সেই কালো কস্ট্যুম-পরা মেয়েটাকে পোস্টমর্টেম করে দেখা গেছে সে দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বুঝতেই পারছ—ছোট জায়গা, টি-টি পড়ে গেছে।

—তাতে ফাদার পাউন্ড কী করবেন ? উপমন্যা বিবাহিতা। আপনি বুঝি তা জানতেন না ?

—বাবাঃ ! তুমি কি নামধামও মুখস্থ করে রেখেছ নাকি ? কিন্তু বিবাহিতা হলে কী ? এত বছরে তো কিছু হয়নি, তোমার ফাদারের সঙ্গে তিন মাস দোস্তি হতে না হতেই...।

জয় বিরক্ত হয়ে বলল, আমি জানি না। আপনিই বা এই শোনা কথা বিশ্বাস করলেন কী করে ?

ঘণ্টু ঘোষ বললেন, হাসালে তুমি ! কিছু কিছু কথা থাকে, যা দেখার নয়, দেখা যায় না, শুনেই বিশ্বাস করতে হয়।

এমন সময় হিতেন মিত্তির পাইপ-মুখে একটা লাল-নীল-হলুদ ছাতা হাতে বারান্দা বেয়ে জয়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পাইপটা মুখ থেকে বের করে বললেন, আরে ঘণ্টু, তোর চেহারাটা গণ্ডারের মতো হলে কী হয়, স্বভাবটা পদীপিসির। চল তো চল—চাটুজ্জেকে চা খেতে দে, চল হেঁটে আসি। সারা সময় ঢেকুর তুলছিস, তবুও সমানে খেয়ে চলেছিস খাদ্য-পানীয়। হাঁটাহাঁটির নামটি নেই।

ঘণ্টু ঘোষ একটু অপ্রতিভ হলেন। পরক্ষণেই সপ্রতিভতার ভান করে নিজের ভুঁড়িতে হাত

BanglaBook.org

বুলিয়ে বললেন, একটু খাবও না ? এই পেটের জন্যেই তো এত খাটাখাটনি, বারো ঘণ্টা দোকান আগলানো—বলো তো চাটুজ্জে ?

মিত্তির সাহেব জয়ের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘণ্টু ঘোষের পাঞ্জাবির হাতা ধরে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁকে. বেড়াতে যাবার জন্যে।

কিছুক্ষণ পর জয় বেরিয়ে পড়ল হোটেল ছেড়ে।

এখনও সন্ধে হতে বাকি আছে। তবে সূর্যটা নেমে গেছে ব্যাকওয়াটারের পাশের ঝাউবনে। আধ ঘণ্টাখানেক পরই অন্ধকার নেমে আসবে এই সমুদ্রপারের গ্রামে। লাইটহাউসের আলোটা জ্বলে উঠবে, চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে কোনও নিষ্ঠুর নিয়তির ঘূর্ণায়মান হাতের মতো।

জয় প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাংলো পেরিয়ে ধ্বসে যাওয়া রাজবাড়ির দেওয়াল বাঁদিকে রেখে বাজারের দিকে হেঁটে গেল।

যাত্রা শুরু হতে এখনও দেরি আছে। তখন থেকেই অবশ্য ভিড় জমতে শুরু করেছে। জয় বাজারটাকে পাশ কাটিয়ে নির্জন রাস্তা ধরে গ্রামের বাইরে চলে এল।

বেলা পড়ে গেছে। পশ্চিমের আকাশের বিষণ্ণ ম্লান পটভূমিতে মুত্তেলামা আর টোটম্মার মন্দিরের পাহাড়টার কালো শিল্যুট বিষণ্ণতর দেখাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জয়ের চোখে পড়ল পাহাড়ের উপরে একটি বলিষ্ঠ মানুষ একেবারে ভীরুর মতো গুটিসুটি হয়ে একটা বড় পাথরের উপরে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বড় করুণ ভঙ্গিতে বসে আছে। কয়েক পা হেঁটে যেতেই জয়ের হঠাৎ মনে হল, এই অন্ধকার বিষণ্ণতার প্রেতমূর্তিটি আর কেউ নন, ফাদার পাউন্ড।

জয় আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে লাগল। উঠে যেখানে ফাদার পাউন্ড বসেছিলেন সেখানে গিয়ে একটা পাথরে বসে পড়ল। ফাদার পাউন্ড তখনও মুখ তুললেন না।

একটু পরে আস্তে আস্তে জয় বলল, ফাদার, এখানে অনেক সাপ আছে। অন্ধকারে বসে থাকবেন না এভাবে।

ফাদার হাঁটু থেকে মুখ তুললেন, স্বপ্নোত্থিতের মতো তাকালেন। বললেন, কী বললে ?

ফাদার পাউন্ড যেন কী ভাবছিলেন—জয় কী বলল শোনেননি।

জয় সেই অন্ধকারে দেখতে পেল ফাদার পাউন্ডের দু'চোখে দু'ফোঁটা জল চিকচিক করছে।

জয় আবার বলল, অন্ধকার হয়ে গেছে, অনেক সাপ আছে এখানে।

ফাদার পাউন্ড এক শান্ত স্তিমিত হাসি হাসলেন। শব্দ হল না। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর হাসি সেই নিস্তব্ধতাকে গভীরতর করে তুলল।

ফাদার বললেন, সব জায়গায়ই অন্ধকার, হয়তো সব জায়গায়ই সাপ আছে।

জয় বলল, ফাদার... ?

ফাদার মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না চ্যাটার্জি। তারপরই বললেন, আমাকে একটু একা থাকতে দাও, আমার সব অঙ্ক কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। আমাকে ভাবতে দাও—একা একা। প্লিজ।

জয় বলল, আপনি বসুন, আমি যাচ্ছি।

পাহাড় থেকে সাবধানে পা ফেলে ফেলে অন্ধকারে নামতে নামতে জয় একবার পিছন ফিরে দেখল ফাদারকে। ফাদার আবার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফেলেছেন।

জয় ভাবল, পাউন্ড সাহেবও হয়তো একটা পুরনো বাজ হয়ে যাবে। ওই পাথরেই সারাজীবন বসে থাকবে। পাহাড় থেকে আর নামতে পারবে না।

কোনও পাথর থেকে একটা তক্ষক অন্ধকারে তিনবার ডেকে উঠল—টাক্, টাক্, টাক্।

জয় এবার কী করবে, কোথায় যাবে বুঝতে পারল না। এখানে আসা অবধি এই প্রথম ওর নিজেকে শুধোতে ইচ্ছে হল, ও কেন এখানে এসেছে ? ওর মনে হল, ওর কোথাও যাবার নেই। ও কি সত্যিই ছুটি কাটাতে এসেছে ? যাদের মস্তিষ্ক আছে এবং যারা সে মস্তিষ্ক কাজে লাগায়, তারা কি কখনও কোথাও গিয়ে একা একা ছুটি কাটাতে পারে ? তাদের ছুটি বোধ হয় কাজের চেয়েও বেশি

BanglaBook.org

দুর্বিষহ হয়। তার চেয়ে কাজের মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে, দৈনন্দিনতার গ্লানি ও ঘামের মধ্যেই ফিরে যাওয়াই ভাল। তাহলে হয়তো এই ভাবনার অক্টোপাসের হাত থেকে মুক্তি পাবে সে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কভাবে জয় কখন যে সমুদ্রের দিকেই এসে পড়েছিল, ও জানে না। কখন যে অন্ধকার সমুদ্রের কোলে কোলে চন্দ্রাইয়াদের বস্তির দিকে ও এগিয়ে যাচ্ছিল ওর খেয়াল নেই।

হঠাৎ সামনের অন্ধকার থেকে ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে কে যেন বলল, বাবু, দেশলাই আছে ?

জয় চমকে উঠল। দেখল সেই বেঁটে নুলিয়াটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য ! এ ক'দিন ও বিকেলে আসেনি বলেই হোক কি যে কারণেই হোক, এই অদ্ভুত নুলিয়াটাকে চোখে পড়েনি।

জয় অন্যমনস্কভাবে দেশলাইটা পকেট থেকে বের করে দিল।

লোকটা সেদিনকার মতোই আবার একটা ছোটকঁলু ধরাল। দেশলাইয়ের আভায় ওর কুচকুচে কালো মুখ চকচক করতে লাগল। আজকেও জয় অবাক হয়ে দেখল, ওর চোখের মণি দুটো জয়ের চোখের মণির উপরে সোজাসুজি চেয়ে আছে।

দপ করে দেশলাইটা নিভে গেল। লোকটা ছোটকঁলুতে একটা বড় টান লাগিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বাবু, চাই ?

জয় বলল, কী চাই ?

লোকটা জয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল, কথা বলল না।

জয় কী ভেবে বলল, বদলে কী নেবে ?

লোকটা খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, খুব সস্তা, বাবু। দাম এখন কমে গেছে। মাত্র তিন টাকা।

জয় চমকে উঠল।

তারপর জয়ের উপরের চোয়ালটা জোরে চেপে বসল নীচের চোয়ালের উপর। সীমার চিঠিটার কথা মনে পড়ল জয়ের। ওর মনের ভালবাসা আজ একটা অতীতের গলিত-গন্ধ-শব হয়ে গেছে।

জয় বলল, চলো। কোথায় যেতে হবে ?

নুলিয়াটা বলল, ওই যে, ওই মাছের ঘরের আড়ালে। ওদিকে কেউ যায় না—তাছাড়া আজ সকলেই যাত্রা দেখতে গেছে।

বলেই নুলিয়াটা শিয়ালের মতো নাক উঁচু করে নিঃশব্দ পায়ে আগে আগে চলতে লাগল। সমুদ্রের পার ছেড়ে উপরের ঝাউবনের দিকে এগোতে লাগল।

জয় লোকটার পিছু পিছু সেই মাছের ঘরের পিছনে গিয়ে পৌঁছল।

পাতায় তৈরি, বেড়া-দেওয়া মাছের ঘরটা সমুদ্র থেকে বেশ অনেকটা উপরে ঝাউবনের গাঁ-ঘেঁষা। শীতকালে নুলিয়ারা এখানে মাছ শুকোয়। এখন কেউ থাকে না, কেউ আসে না এখানে। একটা নোনা-নোনা ভেজা-ভেজা সামুদ্রিক গন্ধ উঠছে ঘরটা থেকে। দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। এখনও মাছের ঘরটা শুকোয়নি ভাল করে।

লোকটা বলল, আপনি বসুন বাবু, ঘরের পাশে বসুন।

বলেই ঝাউবনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নুলিয়াদের রং এত কালো যে, অন্ধকারে ওদের শরীর দেখা যায় না—ওদের পরনের কাপড়টুকু মাত্র দেখা যায়।

লোকটা কোথায় হারিয়ে গেল বোঝা গেল না।

আধ মিনিটের মধ্যেই একটা সাদা কিছু ঝাউবন থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছে দেখা গেল। জয় দু'চোখ খুলে অন্ধকারের মধ্যে যতটুকু দেখা যায় দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে লোকটা কাছে এসে গেল। তার পিছনে পিছনে একটি ছিপছিপে মেয়ে। মেয়েটি যখন কাছে এল, জয় দেখল ওর পরনে একটি শাড়ি—শুধুই শাড়ি। যেভাবে নুলিয়া মেয়েরা শাড়ি পরে—তার কিছুই নয়। মেয়েটি দৌড়ে এসে ঝুপ করে মাছের ঘরের বেড়ার আড়ালে জয়ের সামনে বসে পড়ল।

এমন সময় লাইটহাউসের আলোটা চকিতে ঘুরে গেল জয়ের এবং মেয়েটির শরীরের উপর দিয়ে। সেই ক্ষণিক আলোয় জয় মেয়েটির মুখটি সম্পূর্ণ দেখতে পেল না। মেয়েটি সুন্দরী কি অসুন্দরী বুঝতে পারল না। মেয়েটির শাড়ির কী রং বুঝতে পেল না। অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছিল

BanglaBook.org

মেয়েটির গড়ন সুন্দর।

বেঁটে নুলিয়াটা বলল, আমি ঝাউবনে চলে যাচ্ছি বাবু, কিছুক্ষণ পরে আসব।

বলেই জয়কে উত্তরে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবারে জয় একা। মেয়েটি একা। আবার লাইটহাউসের আলোটা এক ঝলক ঘুরে গেল ওদের উপর দিয়ে।

এবারেও মেয়েটির মুখ পুরো দেখা গেল না। এবারে শুধু মেয়েটির নাকের নাকছাবিটি দেখা গেল। একটি ছোট্ট পেতলের নাকছাবি—ক্ষণিক আলোয় ঝিকমিক করে উঠল।

মেয়েটি কোনও কথা বলল না। হঠাৎ পিছন ফিরে দু'হাতে বালি খুঁড়ে মাছের ঘরের বেড়ার পাশে জড়ো করতে লাগল। দেখতে দেখতে মেয়েটি একটি বালির তাকিয়া বানিয়ে ফেলল, তারপরই তাতে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে বসে কোনও লজ্জা বা ভান বা কাব্য না করে একটানে নিজের কাপড়টি খুলে পাশে বালিতে ফেলে দিল।

জয় মেয়েটার গা থেকে, চুল থেকে, বুক থেকে, উরু থেকে সমুদ্রের গন্ধ পাচ্ছিল। মেয়েটার নিশ্বাসে সার্ডিনের গন্ধ ছিল। মেয়েটা দু'পাশে দুটি হাত বালির উপর ছড়িয়ে দিয়ে পা দুটি সামনে মেলে চুপ করে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে বসে রইল।

জয় ওকে দেখতে লাগল। তারার আলোয় জয় মেয়েটাকে দেখতে লাগল।

বাতিঘরের আলোটা এক ঝলক ঘুরে গেল। এবারেও মেয়েটির মুখ ভাল করে দেখা গেল না।

মিনিটখানেক পরে মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলল, বাবু, আমার দেরি করে দিয়ো না, আমি যাত্রা দেখতে যাব।

আলোটা আবার একবার ঘুরে গেল। হঠাৎ জয়ের মনে হল মেয়েটার মুখের সঙ্গে সীমার মুখের আদল ভীষণ মেলে। মেয়েটা বেশ দেখতে।

জয় চুপ করে বসে রইল।

মেয়েটা ওর পা দুটি গুটিয়ে নিল। বলল, কী বাবু, আমাকে পছন্দ হল না?

জয় এতক্ষণে কথা বলল; জয় হিন্দিতে বলল, তুমি এসব করো কেন?

এ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আলোটা এসে মেয়েটার মুখে পড়ল। জয়ের মনে হল, মেয়েটার ক্ষণিক মুখে ঘৃণা ও বিরক্তি ফুটে উঠছে।

আলোটা সরে যেতেই জয় আবার বলল, তুমি এসব করো কেন?

উত্তরে মেয়েটা তবুও কথা বলল না। মেয়েটা হঠাৎ জয়ের ডান হাতটা টেনে নিয়ে ওর খোলা পেটের উপর রাখল। জয়ের গা শিরশির করে উঠল। তবু জয় হাতটা সরিয়ে নিল না, জয়ের হাতের আঙুলগুলো ওর পেটে ছড়ানো রইল। মেয়েটার পেটটা মরা ব্যাঙের মতো ঠাণ্ডা, একটুও মেদ নেই পেটে। জয়ের তর্জনী মেয়েটার নাভি ছুঁয়ে রইল।

মেয়েটা খুব আস্তে আস্তে ওর নিজের হাতটা ওর পেটে রাখা জয়ের হাতের উপর রেখে বলল, বাবু, এসব শুধু পেটের জন্যে করি।

বলেই মুখটা অন্ধকারের দিকে ফিরিয়ে নিল সে। এবারে আলো পড়তে জয় মেয়েটার ঘাড় আর নারকোল তেল মাখা চকচকে কালো চুল দেখতে পেল। কিন্তু পুরো মুখটা তবুও দেখতে পেল না।

মেয়েটির পেলব পেটে হাত রেখে তারা-ভরা অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে জয়ের হঠাৎ ঘন্টু ঘোষের কথা মনে পড়ে গেল। ঘন্টু ঘোষের প্রকাণ্ড মেদবহুল পেটটার কথা মনে পড়ল। ঘন্টু ঘোষও বলেছিল যে, যা কিছু সে করে এবং করেছে তা পেটের জন্যে। এই ছিপছিপে মেয়েটাও যা করে সব পেটের জন্যে। অথচ আশ্চর্য, পেটে পেটে কত তফাত।

মেয়েটা একটু উঠে বসল। বসতেই জয়ের আঙুল মেয়েটার যুবতী পাখির পালকের মতো মসৃণ পেট ছাড়িয়ে একটা নরম লাজুক রেশমি কাঠবিড়ালির গায়ে লাগল। জয় শিউরে উঠে হাত সরিয়ে নিল।

ওরকম ভাবে হাত সরিয়ে নেওয়ায় মেয়েটা খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর জয়ের মনে

BanglaBook.org

হল, ওকে তেলেগুতে কোনও গালাগালি দিল বুঝি।

আলোটা বারে বারে অমনি করে ঘুরে যেতে লাগল। তবু মেয়েটাকে পুরোপুরি চেনা হল না।

অনেকক্ষণ জয় ওর সামনে বসে থাকল, অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চেয়ে। তারপর জয় হঠাৎ বলল, তুমি কাউকে কখনও ভালবাসোনি ?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে বোবার মতো চকচকে চোখে জয়ের দিকে চেয়ে রইল।

কী হয়ে গেল জয় জানে না, জয় ডান হাতের আঙুল মেয়েটির গালে রেখে বলল, তুমি কি কখনও কাউকে ভালবেসেছিলে ?

মেয়েটি এবারে লজ্জা পেল : একটু জড়োসড়ো হয়ে বসল, দুটি লতানো হাত দিয়ে বুক দুটিকে আড়াল করল। একটু ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, বেসেছিলাম ; এখনও বাসি।

জয় উৎসুক হয়ে বলল, কাকে ? কাকে ভালবাসো ?

মেয়েটি বলল, পেটকে। পেট বড় জ্বালা করে বাবু। পেট ছাড়া আর কিছু ভালবাসার সময় পাইনি।

আলোটা আরও একবার ঘুরে গেল। মেয়েটি সোজা হয়ে বসে বলল, তুমি বুঝি কাউকে ভালবেসেছ বাবু ?

জয়ের শরীরে যেন ইলেকট্রিক শক লাগল। বলল, বেসেছিলাম।

—কী নাম তার ?

জয়ের অবাক লাগল। আবার হাসিও পেল। জয় বলল, সে নাম জেনে তোমার লাভ কী ?

মেয়েটি বলল, বলোই না। তারপরই আবার বলল, যা করার তাড়াতাড়ি করো, আমি আজ যাত্রা দেখতে যাব বাবু।

জয় বলল, বলছি বলছি, তোমাকে বললে ক্ষতি নেই, সে একজন দারুণ মেয়ে। তার নাম সীমা।

—সীমা ? বলেই মেয়েটা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। হেসে উঠেই বলে উঠল, আমার নাম লছমামা। আমার নামের সঙ্গে খুব মিল তো !

লছমামা, লছমামা, লছমামা।

নামটা জয়ের খুব চেনা-চেনা মনে হল। তারপর হঠাৎ জয়ের মনে পড়ল লছমামার কথা ; চন্দ্রাইয়ার মুখে শোনা ওর বরের কথা।

মনে পড়তেই জয় মাথা নিচু করে ফেলল, মাথা নিচু করেই রইল।

লছমামা হাসতে লাগল।

আজও লছমামা নিশ্চয়ই সেই লাল শাড়িটিই পড়ে আছে। এই অন্ধকারে সাদা ছাড়া সব রংকেই কালো বলে মনে হয়।

জয় কোনও কথা না বলে হিপ-পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে লছমামার উন্মুক্ত পেটের উপর রেখে দিল।

রাখতেই নোটটা হাওয়ায় উড়ে ঝাউবনের দিকে চলে গেল—অন্ধকারে।

সঙ্গে সঙ্গে নগ্না লছমামা লাফিয়ে উঠে এক হাতে ওর শাড়ি তুলে নিয়ে ওই অন্ধকারে উড়ে যাওয়া টাকার খোঁজে দৌড়ল। দু' পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল, ঘাড় ফিরিয়ে জয়কে বলল, গাধা। ওরকম করে কেউ টাকা দেয় ? হারিয়ে গেলে কী হবে ?

অন্ধকারে তারা-ভরা আকাশের নীচে ঝাউবনের পটভূমিতে লছমামার বুক, চিবুক ও নিতম্বের শিল্যুট একবার কেঁপে উঠল—তারপরই ও গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে চলে গেল। আর একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

জয়ের মনে হল, একটা সাদা মতো কী ঝাউবন থেকে বেরিয়ে এল। তারপর অন্ধকার বালিয়াড়িতে একটা কালো ভাল্লুকী আর একটা সাদা ভাল্লুক যেন পাশাপাশি উবু হয়ে বসে সরে সরে টাকাটা খুঁজতে লাগল। ওরা কেউ আর জয়ের দিকে তাকাল না। জয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ওদের আর কোনও খেয়াল রইল না।

BanglaBook.org

লাইটহাউসের আলোটা ঘুরতে লাগল নিঃশব্দে বারে বারে, চক্রাকারে। বিশ্বাস অবিশ্বাস, শরীর মন, প্রেম ঘৃণা—সব কিছুর উপর দিয়ে।

সেই সময় দূরের ভাঙা লাইটহাউসটার উপরের কানা বাজটা হঠাৎ চিহ্-হ্-হ্-হ করে ডেকে উঠল। একবার ডেকেই থেমে গেল।

জয় চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। এতদিনে পুরনো বাজটা কি কিছু ভেবে পেল? অন্ধকারে লছমামা কি ওকে কিছু বলেছে দৌড়ে গিয়ে? উপমন্যা এখনও কি তার কালো সুইমিং কস্ট্যুম পরে অন্ধকার ঝাউবনে বালিয়াড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে? পুরনো বাজের কানে কানে উপমন্যা কি কোনও কথা বলে এসেছে? যে কথা ও জয়কে বা অন্য কাউকে বেঁচে থাকতে বলতে পারেনি?

জয় একা একা অন্ধকার বালিয়াড়িতে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে যেতে লাগল বাজারের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে জয়ের গা ছমছম করে উঠল।

সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে জয় হেঁটে গিয়ে বাজারের কাছাকাছি এসে পাড় ছেড়ে উপরে উঠল। উপরে উঠেই এতক্ষণের অন্ধকার-অভ্যস্ত ওর চোখ দুটি আলোয় আলোয় ঝলসে গেল। উপরে উঠেই জয় দেখল চন্দ্রাইয়া মোড়ের মাথায় পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য একজন নুলিয়ার সঙ্গে কথা বলছে।

জয়কে উঠতে দেখেই চন্দ্রাইয়া ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। জয়ের খুব ভয় করতে লাগল। চন্দ্রাইয়া জানতে পেলে কী হবে? চন্দ্রাইয়া তো কিছু বুঝবে না, ও তো কোনও কথাই শুনবে না। চন্দ্রাইয়া ভাববে যে, সব বাবুরাই সমান। জয় ভাবল, আসলে হয়তো তাই-ই, সব ভদ্রলোকরাই বোধ হয়, সীমাদের ভালবাসে, উপমন্যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং লছমামাদের সঙ্গে শোয়। ভদ্রলোকদের জীবনের এই-ই বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী ট্রাজেডি। সীমাদের না পেয়ে ওরা লছমামাদের নিয়ে নিজেদের ভোলায়। কিন্তু জয় তো সেটুকুও পারে না। ও যে কোনওভাবেই সীমাকে ভুলতে পারল না।

চন্দ্রাইয়া বলল, কোথায় ছিলে বাবু? আমি তোমাকে খুঁজতে হোটেলে গেছিলাম। চলো চলো, যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল।

বলেই জয়ের কাছ থেকে কোনও উত্তরের প্রত্যাশা না করে চন্দ্রাইয়া সামনের ভিড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

আজ এই গ্রামের পথে পথে শোভাযাত্রা। দোকানে দোকানে ইলেকট্রিক আলো ছাড়াও কারবাইডের আলো, পেট্রোম্যাক্স ইত্যাদির সমারোহ। নানারকম বাজনা বাজছে—বাচ্চারা ধেই-ধেই করে নাচছে—মেয়েরা হলুদ কি গেরুয়া কি লাল শাড়ি পরেছে। মাথায় নারকেল তেল মেখেছে। চূড়া করে চুল বেঁধে তাতে ফুল গুঁজেছে। সকলেরই প্রায় খালি গা। কুচকুচে কালো গায়ে তেলতেলে কালো কাটা-কাটা মুখে আলো পিছলে যাচ্ছে। ওরা হাসছে, এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে।

এমন সময় যাত্রা আসছে দেখা গেল। প্রথমে সেই নানারকম রঙিন কাপড় দিয়ে বানানো ঘোড়া, হাতি, বাইসন—নানান জানোয়ার। দু'জন বা চারজন লোক সেই কাপড়ের আস্তরণের নীচে ঢুকে জানোয়ারদের গতি দিয়েছে। মাঝে মাঝে জানোয়াররা মুখ নাড়ছে, শিং ঝাঁকাচ্ছে। কতকগুলো লোক মাথায় জলের কলসি নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে পথে জল চল্‌কে ফেলতে ফেলতে এঁকেবেঁকে চলেছে। তারপরই মাথায় করে মুত্তেলামা আর টোটম্মাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টোটম্মা বড় বোন, আর মুত্তেলামা ছোট।

চন্দ্রাইয়ার সঙ্গে জয় মোড়ের কালভার্টের উপর উঠে বসে রইল। এখান থেকে পুরো যাত্রা দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে লোক। ছেলেমেয়ে, বাচ্চাকাচ্চা, বুড়োবুড়ি। ওদের প্রত্যেকের গায়ে ঘাম এবং বগলের নোনা গন্ধ, ছোটকঁলুর ধোঁয়ার গন্ধ, দোকানের শুঁটকি মাছের গন্ধ, কুনো নারকেলের ছোবড়ার গন্ধ, কারবাইডের গন্ধ—সব মিলেমিশে জয়ের নাকে এমন একটা তীব্র গন্ধ এসে পৌঁছচ্ছে যে ওর রীতিমত নেশা-নেশা লাগছে।

চন্দ্রাইয়া একটু বসে থাকার পরই একটি বুড়ো নুলিয়া, বোধ হয় ওর বন্ধুই হবে, এসে ওকে

BanglaBook.org

নিয়ে গেল। চন্দ্রাইয়া চলে গেল। জয় একা একা বসে যাত্রা দেখতে লাগল।

এতক্ষণ পর একা একা একটু বসে ভাববার সময় পেয়ে জয় প্রথম ভাবল, আজকে সে জীবনে যা কখনও করেনি আগে তাই করতে গেছিল, করবার সুযোগ পেয়েছিল। অথচ করতে পারল না কেন ? কেন লছমামার মুখে সীমার মুখের আদল খুঁজে মরল ?

তাহলে এখনও কি মানুষ যাকে মন থেকে ভাল না বাসে, তাকে শরীরের ভালবাসা দিতে কার্পণ্য করে ? তার কি ইচ্ছে করে না ? কোনও শরীরের উপরে অন্য কাউকে নিবেদিত ভালবাসা কল্পনায় আরোপ করে নিয়ে কি সে শরীরকে সোহাগ করা যায় না ?

কে জানে, হয়তো যায়—হয়তো যায় না। কিন্তু জয় এটুকু জানে যে, ওই পরিবেশে ওই মাছের ঘরের পাশে সমুদ্রের হাওয়ায় এবং ঝাউবনের ফিসফিসানিতে কোনওদিন তার সীমা যদি অমনি করে তাকে ডাকত, তবে জয় তাকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিত। তার চোখের পাতায়, চিবুকে, তার নূপুরের মতো নিবিড় নাভিতে চুমু খেত। তার সিল্কের শাড়ির মতো মসৃণ উরুতে মাথা রেখে শুয়ে থাকত।

কতদিন—কতদিন স্বপ্নে খেলেছে জয়। কতদিন কত খেলা খেলেছে সীমার সঙ্গে—সীমার কবুতরী বুকে হাত রেখে স্বপ্নের মধ্যে ঘুমিয়েছে, সীমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কতদিন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠেছে। কিন্তু লছমামা সীমা নয়। সীমা—সীমা।

তাহলে বোধ হয় বিশ্বাস আছে, ভালবাসা এখনও আছে পৃথিবীতে, নইলে কেন এমন হয় ? সুন্দর নগ্ন শরীরের সস্তা নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে কেন স্বপ্নের মধ্যে নিষ্ঠুর একজনের দামি নরম হাতে হাত রেখে শুধু কাঁদতেই হয় ? সারাজীবন কত না নিমন্ত্রণ মাড়িয়ে এসে মন কেন একটি মূল্যবান ঘৃণার মধ্যে মাথা উঁচু করে বসে থাকে ? কেন ? কেন ?

জয় কালভার্টের পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল।

জয়ের খুব ক্লান্তি লাগছিল। আরামে হেলান দিয়ে বসে ওর সামনের ও আশপাশের নানান লোকের মধ্যে ও হঠাৎ দারুণ একাকিত্ব বোধ করতে লাগল। সব বাজনা ও চিৎকার ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে হতে থেমে গেল। ওর চোখের সামনে চলমান যাত্রা, হুলুদ্ধ ও গেরুয়া শাড়ি পরা গর্জন-তেল-মাখা মেয়েদের মুখগুলি এক এক করে মুছে গেল। সব ক'টি ইলেকট্রিক বাল্‌ব, কারবাইডের আলো, পেট্রোম্যাক্স এক এক করে নিবে গেল।

জয়ের মনে হল, ওর খাটের পাশে সীমা এসে বসে আছে—সেদিনকার স্বপ্নের মতো, ওর কানে একজোড়া মুক্তোর দুল, ওর সুন্দর কানের লতি, ওর অলক, ওর মিষ্টি সুকুমারী চিবুক সমেত ওর মুখটা জয়ের দিকে ফেরানো। সীমার মুখে একটি মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। সীমা কোনও কথা বলছে না—সীমা এক নরম নীরব অথচ উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হাসি হাসছে জয়ের দিকে চেয়ে। তেমন হাসি একমাত্র কাউকে ভালবেসেই কোনও মেয়ে হাসতে পারে।

১১

হোটেলে ফিরে জয় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে জয় দেখল, সমুদ্রের পারের দিকে ও নেমে যাচ্ছে। তখন গভীর রাত।

হিতেন মিত্তির একটা দারুণ ঢোলা পুরনো যুগের সাদা ফুলপ্যান্ট পরে তার উপর একটা বাসন্তের বুশশার্ট পরে বাঁদিকের পকেটে বাঁ হাত ঢুকিয়ে, ডান হাতে পাইপটি মুখে ধরে রাতের অন্ধকার সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। জুডিথ একটা রঙিন স্কার্ট পরে হিতেন মিত্তিরের পাশে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিসেস জেমস্, ঘণ্টু ঘোষ, তোতো সেন—সবাই এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রতীরের বালিতে ব্যাকওয়াটারের দিকে চেয়ে। অন্ধকারে সমুদ্রের ঢেউ উথালপাথাল করছে।

জয় পৌঁছতেই হিতেন মিত্তির বললেন, বড় দেরি করলে তুমি, তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি।

তারপরে আবার বললেন, তুমি সঙ্গে কিছু আনোনি ?

BanglaBook.org

জয় বলল, মানে ? কী আনব ?

হিতেন মিত্তির কথা না বলে বুকপকেট থেকে একটা সুগন্ধি সাদা গন্ধরাজ ফুল বের করে বললেন, এই নাও, ধরো।

জয় হাত বাড়িয়ে ফুলটা নিল।

ঘণ্টু ঘোষ একটা হাফপ্যান্ট পরেছেন ; গায়ে সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি, হাতে একশো টাকার নোটের একটা মোটা বাণ্ডিল। তোতো পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছে, ওর হাতে এক কপি চে'গুয়েভারার ডায়েরি। চন্দ্রাইয়ার কাঁধে ক্যাটামেরনের একটিমাত্র দাঁড় লাঠির মতো করে শোয়ানো। দাঁড়ের মাথায় একগোছা পেতলের ঘন্টা ঝোলানো। মিসেস জেমসের হাতে কামসূত্রের একটি ঝকঝকে কপি।

হিতু মিত্তিরের কথামত জয় ওদের পাশে সাদা ফুলটি হাতে করে গিয়ে দাঁড়াল—এক লাইনে।

জয় দেখল, জুডিথের হাতে ওর পিস্তলটা।

জুডিথ আকাশের দিকে হাত উঁচু করে হিতেন মিত্তিরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ও স্টার্টার। হিতু মিত্তির বললেই ও স্টার্ট দেবে।

জয় বুঝতে পারল না, অন্ধকারে ওদের কোথায় যেতে হবে। হোটেলের আর সব লোকই এখনও ঘুমিয়ে আছে কেন ? এমনকী চৌকিদারদেরও কেন দেখা যাচ্ছে না ? সমুদ্রের কিনারে শুধু ওরা ক'জন মাত্র, ওরা ক'জন কীসের জন্যে এসেছে এত রাতে ?

হিতু মিত্তির পাইপটা মুখ থেকে নামালেন, তারপর বললেন, শোনো সকলে মনোযোগ দিয়ে শোনো যা বলছি। জলের উপর দিয়ে দৌড়ে যাবে তোমরা, তোমরা সকলে অন্ধকারে রাতভর দৌড়ে দৌড়ে অনেক দূর গিয়ে সকাল হয়ে গেলেই দেখতে পাবে সামনে একটা সাদা একতলা বাড়ি—তাতে অনেকগুলো সবুজ জানলা। জানলাগুলো বন্ধ থাকবে। তোমরা কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেই দেখতে পাবে জানলাগুলো··· ।

হঠাৎ গুড়ুম করে একটা গুলির আওয়াজ হল। অন্ধকারে ধপাস করে কিছু একটা পড়ার শব্দ হল।

ওরা সকলে চমকে মুখ তুলে তাকাল পিছন ফিরে।

জুডিথ লজ্জা পেয়ে বলল, আমি পিস্তলটা উঁচু করে ছিলাম। এই প্রকাণ্ড বাজটা সোজা পিস্তলের নলের উপর পিছন থেকে উড়ে এল—ওই ভাঙা লাইটহাউসটার দিক থেকে। আমি ইচ্ছে করে মারিনি, হঠাৎ ট্রিগারে আঙুল লেগে গেল। ঈস্, এখন কী হবে !

জয় তাকিয়ে দেখল, কানা বাজটার বুকে গুলি লেগেছে। সেখানকার বালি রক্তে কালো হয়ে গেছে।

হিতেন মিত্তির বললেন, তোমরা এসো তো, একটু হাত লাগাও, এসো এই জঞ্জালটাকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলি।

ওরা সকলে মিলে পুরনো বাজটার ডানা ধরে তুলে সেটাকে বারকয়েক দুলিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

হিতু মিত্তির বললেন, যাও, তোমরা নিজের নিজের জায়গায় যাও। আমি বলব, রেডি, গো—সেট গো—এবং জুডিথ পিস্তল ছুঁড়বে।

তারপরই মিত্তির সাহেব বললেন, শোনো, জানলাগুলো কিন্তু বন্ধ থাকবে। সকলের জানলা যে খুলবেই এমন কোনও কথা নেই। কোনও কোনও জানলা খুলে যাবে—তোমরা যেতে যেতেই খোলা জানলায় দেখতে পাবে অন্য কেউ সেখানে তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তোমাদের হাতের ফুল, টাকা, বই, তোমাদের বিশ্বাস—যাই-ই তোমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছ তা সেই অপেক্ষমাণ লোকের হাতে তুলে দেবে, তারপর তারা আবার দৌড়ে দৌড়ে যাবে তোমাদের হাতের গন্ধ, তোমাদের বিশ্বাস নিয়ে অন্য কারও হাতে তুলে দিতে।

মিসেস জেমস্ বললেন, মিঃ মিটার, যদি আমার জানলা না খোলে ? তা হলে ?

হিতু মিত্তির হাসলেন ; বললেন, তা হলে ? তা হলে জানি না। আমি যা জানি, যতটুকু জানি

BanglaBook.org

তাই বললাম।

হিতু মিত্তির বললেন, রেডি, গেট-সেট গো—সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম করে একটা গুলির শব্দ হল।

জয়রা সবাই জলের উপর দিয়ে অবলীলায় দৌড়ে চলল। জয়, তোতো, ঘণ্টু ঘোষ ওরা সকলে দৌড়ে চলল সেই সবুজ জানলাওয়ালা অদেখা সাদা বাড়িটার দিকে, যেখানে তাদের প্রেমিকা, তাদের পার্টনার, তাদের কমরেডরা অপেক্ষা করে আছে, ওদের হাতের গন্ধমাখা বিশ্বাস নিয়ে ওরা দৌড়বে বলে।

ওরা সকলে এক দারুণ দৌড়-এ নেমে পড়েছে।

ওদের জন্যে কেউ অপেক্ষা করে থাকবে কিনা ওরা জানে না, তবু—তবু ওদের ঢেউয়ের উপর দিয়ে দৌড়ে যেতেই হবে। যতদিন ওরা থাকে, যতদিন বিশ্বাস থাকে এই পৃথিবীতে।

জল ছপ ছপ করে ওরা দৌড়ে যাচ্ছিল।

চন্দ্রাইয়ার কাঁধের দাঁড়ে ঝোলানো পেতলের ঘণ্টাগুলো ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ ডুঙ, ডুঙ করে নাচছিল। ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল।

ডান হাতে ফুলটা উঁচু করে ধরে জয় দৌড়চ্ছিল। ওদের সকলের মুখ বন্ধ, চোয়াল শক্ত। ওরা মনে মনে বলছিল, আমার প্রেমিকা, আমার বন্ধু, আমার পার্টনার, আমার কমরেড—তোমরা সকলে তৈরি থেকো, নইলে রুদ্ধ জানলায় ব্যর্থ করাঘাত করতে করতে অবিশ্বাসের ফেনিল স্রোতে আমরা ভেসে যাব। ওরা বলছিল, আমরা যাচ্ছি, তোমরা তৈরি থেকো।

হঠাৎ জয় সামনে দেখল, অন্ধকার সমুদ্রে ওদের আগে আগে একটা আলো দুলতে দুলতে চলেছে।

ওরা বড় বড় পা ফেলে আলোটার দিকে এগিয়ে গেল। এগিয়ে যেতেই দেখল, লণ্ঠন-হাতে ফাদার পাউন্ড ওদের সামনে সামনে দৌড়ে যাচ্ছেন।

ফাদার পাউন্ড মুখ ফিরিয়ে ওদের দেখলেন, কিন্তু দাঁড়ালেন না, দৌড়ে যেতে লাগলেন। খালি গায়ে সেই মিঁ-রঙা শর্টস্ পরে ওদের আগে আগে ফাদার পাউন্ড দৌড়তে লাগলেন।

পাশে পৌঁছে তোতো হেসে উঠল।

হেসে উঠে বলল, ফাদার, আপনাকে বুঝি কেউ বলেনি যে, একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে? সূর্য উঠবে? লণ্ঠন হাতে দৌড়বার কোনও মানে হয় না!

ফাদার পাউন্ড দৌড়তে দৌড়তে আবার একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন, কথা বললেন না। মাথা নিচু করে দৌড়তে লাগলেন।

ওরা সকলে জলে ছপছপ শব্দ করে, নোনাজলে আর হু-হু হাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত দৌড়ে যেতে লাগল।

ওদের সামনে লণ্ঠনের সোনালি আলোর আশার ফালিগুলি কাঁপতে লাগল জলের উপর, অবিশ্বাসী জলজ অন্ধকারে।

BanglaBook.org